তিন গোয়েন্দা

তিন বিঘা

রকিব হাসান

বনের মধ্যে ছোট্ট কটেজ।
বাসিন্দা দুজন নিরীহ মানুষ।
রাত দুপুরে ভূতের আনাগোনা।
দিনের বেলা গুলির শব্দ।
দূরবীনে চোখ রেখে কটেজের দিকে
তাকিয়ে থাকে, ও কে?
সাহায্য করতে চাইল তিন গোয়েন্দা।
রাজি হলো না বাসিন্দারা।
কিন্তু কোন রহস্যের দিকে নজর দিলে
সমাধান না করে স্বস্তি নেই কিশোর পাশার।
খুঁড়তে আরম্ভ করল সে।
বেরিয়ে এল 'মিসেস ড্রাকুলা'।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তিন গোয়েন্দা
তিন বিঘা
রকিব হাসান

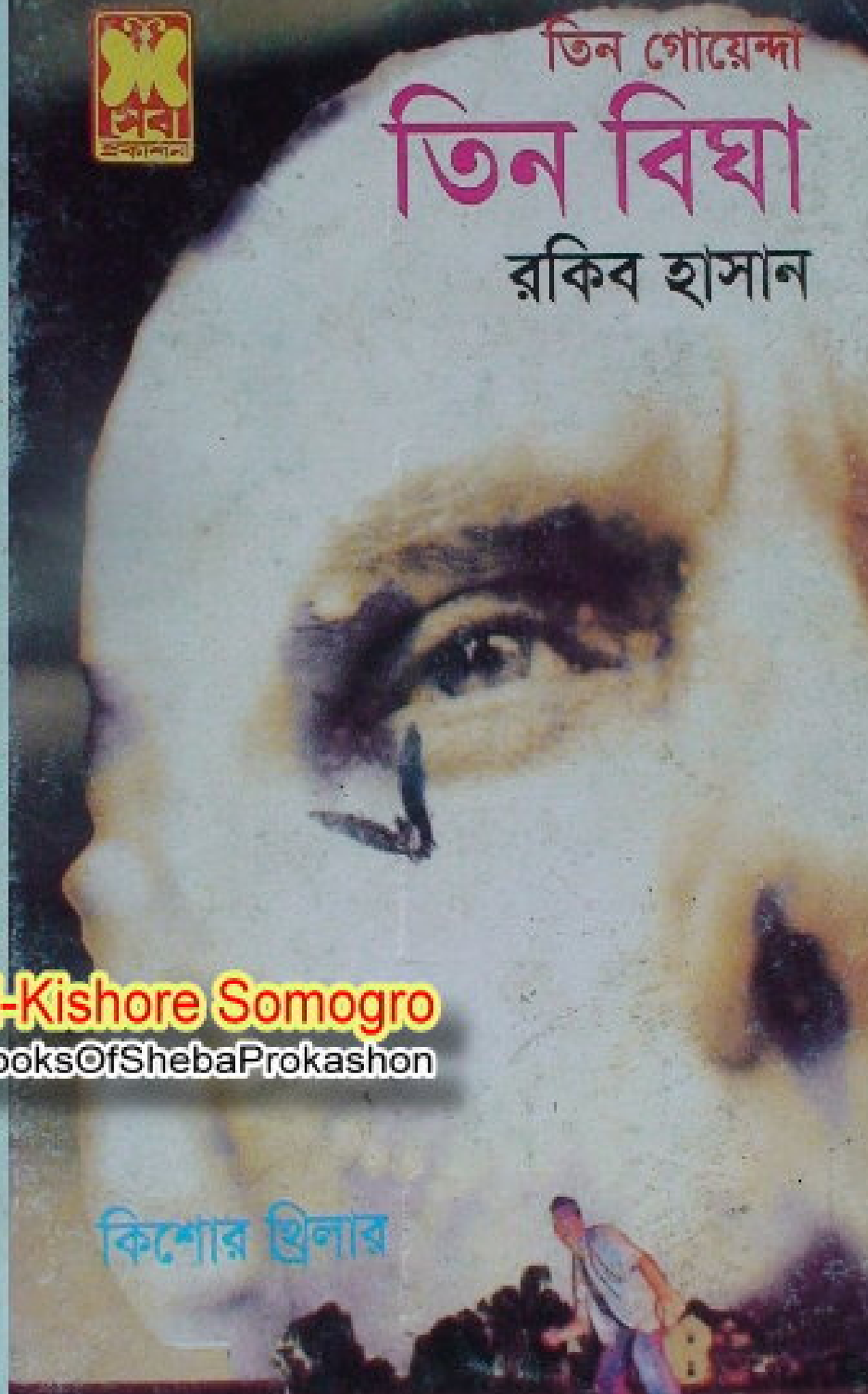

কিশোর থ্রিলার

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

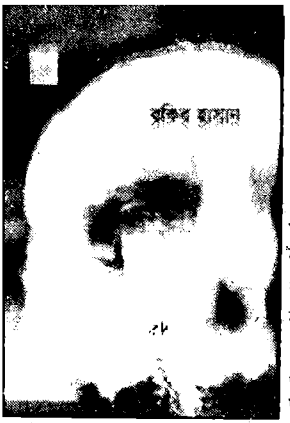

তিন বিঘা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

ম্যানিলা রোডের শেষ বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামালেন মিস কেলেট। বাড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল কিশোর, 'দারুণ কটেজ!'

বন আর পাহাড়ের কোলে ছবির মত একটা বাড়ি। পুরানো পাথরের দেয়াল, টালির ছাত, পর্দা ঢাকা জানালা। বিরাট বাগানটাতে উজ্জ্বল রঙের ফুলের মেলা। ঝোপঝাড় আর বেড়গুলো সব পুরানো ধাঁচে তৈরি।

ওল্ড-মেন'স ভলান্টিয়ার সার্ভিসের একজন সদস্য মিস কেলেট। টীম-প্রধানদের একজন। কিশোরও জুনিয়র মেম্বার। আজ ওর আসার কথা ছিল না; যার আসার কথা সে অসুস্থ থাকায় মিস কেলেটের অনুরোধে তাকে আসতে হয়েছে।

'হ্যাঁ,' কিশোরের হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন মিস কেলেট। 'সেভারনরা এসেছেন এখানে বছরখানেক হলো।' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।'

আবার হাসল কিশোর। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। 'যাহ্, ঠাট্টা করছেন!'

'না, ঠাট্টা করছি না। আমার সামনেই স্ত্রীকে বকাবকি করেছেন মিস্টার সেভারন, ভয় পান বলে। অদ্ভুত সব শব্দ নাকি শুনতে পান মহিলা, ঘরের মধ্যে নাকি ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। কারা নাকি হাসাহাসি করে। বেচারি!'

'হুঁ। ভূতের গল্প আমার ভাল লাগে। মিসেস সেভারনকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিতে হবে।'

'দেখো, সারাদিন ধাক্কিয়েও দরজা খোলাতে পারো নাকি,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বললেন মিস কেলেট। 'আজকাল অপরিচিত কাউকে দেখলে দরজাও খুলতে চান না ওঁরা।'

'কেন?'

'জানি না। কিছু হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু স্বীকার করলেন না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময়।'

কান খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের। ভাল কোন রহস্য পেলে আর কিছু চায় না সে।

'দেখো, মুখ খোলাতে পারো কিনা। বুড়োবুড়ি খুব ভাল মানুষ। বলেও ফেলতে পারেন।'

'যদি ঢুকতেই না দেন?'

হাসলেন মিস কেলেট। 'যাও, আমি আছি এখানে। দরজা না খুললে পরে যাব। নাকি এখনই সঙ্গে যেতে বলছ?'

গাড়ির দরজা খুলল কিশোর। 'না, আমিই যাই। লাঞ্চ নিয়ে গেছি দেখলে না খুলে পারবেন না। আধঘণ্টা পর এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।'

ঘুরে গাড়ির পেছনে চলে এল কিশোর। হীটেড ট্রলি থেকে গরম গরম দুই প্লেট রোস্ট বীফ আর এক প্লেট পুডিং বের করল। হাত নেড়ে মিস কেলেটকে চলে যেতে ইশারা করে পা বাড়াল কটেজের মরচে পড়া গেটটার দিকে।

নীল রঙ করা সামনের দরজায় টোকা দিল সে। চিৎকার করে বলল, 'ওল্ড-মেন'স ভলান্টিয়ার!'

সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল সে। জানালায় পর্দা টানা। ভেতরে কেউ আছে কিনা উঁকি দিয়ে দেখার উপায় নেই। দোতলার দিকে তাকাল। ওখানকার বেডরুমের জানালায়ও পর্দা টানা। বাড়ি আছেন তো সেভারনরা?

কি করবে ভাবছে কিশোর, এই সময় ফাঁক হয়ে গেল নিচতলার জানালার পর্দা। দেখা গেল একটা মুখ।

'ওল্ড-মেন'স ভলান্টিয়ার!' সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে। 'আপনাদের লাঞ্চ নিয়ে এসেছি।'

বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা।

দরজার শেকল খোলার শব্দ। ছিটকানি খুলল। দরজা খুলে দিলেন এক বৃদ্ধা। ছোটখাট মানুষ। মাথার চুল সব সাদা। সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে।

'মিসেস সেভারন?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা, 'হ্যাঁ।'

'আপনাদের লাঞ্চ নিয়ে এসেছি। জলদি নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমাকে তো চিনি না। মিস কেলেট কোথায়?'

'আরেক বাড়িতে গেছেন। আমি তাঁর সহকারী। একা পেরে ওঠেন না। তাই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমার নাম কিশোর পাশা।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের আপাদমস্তক দেখলেন বৃদ্ধা। মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'জন, লাঞ্চ।' কিশোরের দিকে ফিরে অস্বস্তিভরা হাসি হেসে শেকলটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। 'এসো। কিছু মনে কোরো না। আজকাল অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দিতে ভয় লাগে আমাদের।'

'হ্যাঁ, সাবধান থাকা ভাল। চোর-ডাকাতে ভরে গেছে দেশটা।'

কিশোর ঘরে ঢুকতেই দরজা লাগিয়ে ছিটকানি তুলে দিলেন বৃদ্ধা। তার হাত থেকে ট্রে-টা নিতে নিতে বললেন, 'তুমি কি একটু বসবে? আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই?'

'সারুন, সারুন, কোন অসুবিধে নেই। আমি বসছি। মিস কেলেটের

ফিরে আসতে সময় লাগবে।'

রান্নাঘরে ট্রে-টা রেখে এলেন মিসেস সেভারন। কিশোরকে নিয়ে এলেন বসার ঘরে।

'থ্যাংকস,' পুরানো, আরামদায়ক একটা সোফায় বসে বলল কিশোর। ওক কাঠে তৈরি ছোট কফি টেবিলে রাখা দুটো ম্যাগাজিন আর একটা ছবির অ্যালবাম। 'অ্যালবামটা দেখি? মানুষের ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার।'

'দেখো। তবে মানুষের ছবির চেয়ে এই কটেজের ছবিই বেশি।'

সেভারনরা লাঞ্চ খেতে বসল। অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। কটেজ আর বাগানটার সুন্দর সুন্দর ছবি। বাগানের ঠেলাগাড়িতে বসা এক বৃদ্ধের ছবি আছে। মিস্টার সেভারনের ছবি, অনুমান করল কিশোর।

প্রথম পাতায় রয়েছে এক যুবকের বেশ কয়েকটা ছবি। খাটো করে ছাঁটা চুল। লম্বা, সুগঠিত শরীর, ব্রোঞ্জ-রঙ চামড়া। পরনে জিনস আর কলেজ সোয়েটশার্ট। মিসেস সেভারনের সঙ্গে চেহারার অনেক মিল।

অ্যালবাম থেকে মুখ তুলে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। ছোট্ট ঘর। ওক কাঠের মোটা মোটা কড়িকাঠ। ম্যানটলপীসে রাখা মাউন্টে একটা ছবি—অ্যালবামে যে যুবকের ছবি আছে তার। অ্যাথেনসের পারথেননের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা। কড়া রোদ। পিঠে ঝোলানো ব্যাকপ্যাক। হাসিমুখে ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দ্রুত অ্যালবামের বাকি পাতাগুলো দেখা শেষ করে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল কিশোর। টান লেগে ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল একটা চিঠির খাম। ওপরে ছাপ মারা একটা লোগো—কোন কোম্পানির নামের আদ্যক্ষর যুক্ত করে তৈরি। সাধারণ জিনিস। কৌতূহল জাগাল না কিশোরের। খামটা আবার আগের জায়গায় ঢুকিয়ে রাখল সে।

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেভারন।

'ও কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিলেন বৃদ্ধা। 'ভলান্টিয়ার সার্ভিসের সদস্য।'

সোফা থেকে উঠে গিয়ে মিস্টার সেভারনের সঙ্গে হাত মেলাল কিশোর, 'হালো, মিস্টার সেভারন। অ্যালবামটা খুব সুন্দর।' ম্যানটলপীসের ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি আপনাদের ছেলের ছবি?'

ছেলের কথা উঠতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন দুজনে। তাঁদের ভঙ্গি দেখেই বুঝে গেল কিশোর, কি যেন গোপন করতে চাইছেন। অবাক হলো সে।

'ইয়ে…' আমতা আমতা করে জবাব দিলেন মিসেস সেভারন, 'ছুটিতে থাকার সময় ওর কোন বন্ধু হয়তো তুলেছিল ছবিটা। হঠাৎ করেই একদিন ডাকে এসে হাজির, ও…'

'ও, কি?' কৌতূহল হলো কিশোরের।

'ও…ও চলে যাবার পর।' অ্যালবামটা তুলে নিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন মিসেস সেভারন।

'তারমানে এখানে থাকে না আপনাদের ছেলে?'

মাথা নাড়লেন মিসেস সেভারন 'না'

ফায়ারপ্লেসের সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন মিস্টার সেভারন। ভঙ্গি এখনও আড়ষ্ট।

'তাহলে কোথায়...?' জিজ্ঞেস করতে গেল কিশোর।

'দূরে থাকে,' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার সেভারনের কণ্ঠ।

স্পষ্ট বোঝা গেল এই প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চান না মিসেস সেভারনও। 'কোন স্কুলে পড়ো তুমি?'

'রকি বীচ হাই।'

দুজনের আচরণে কৌতূহল বেড়ে গেছে কিশোরের। ছেলের সম্পর্কে কথা বলতে চান না কেন? বুড়ো মানুষেরা তো সাধারণত ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই খুশি হয় বেশি, যতটা পারে বকর বকর করে, কিন্তু এঁরা ঠিক উল্টো। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন নাকি?

'কোথায় থাকো?' জানতে চাইলেন মিস্টার সেভারন।

ইয়ার্ডের ঠিকানা জানাল কিশোর।

'রকি বীচে কতদিন?' মিসেস সেভারন জিজ্ঞেস করলেন।

'বহু বছর। প্রায় জন্মের পর থেকে।'

'ভাল লাগে?'

'লাগে।'

'আমরাও আছি বলতে গেলে প্রায় সারাটা জীবনই। জ্যাকিও এখানেই জন্মেছে...'

মিস্টার সেভারনের ভ্রূকুটি দেখে থেমে গেলেন মিসেস সেভারন। লক্ষ করল কিশোর।

'এই কটেজটা কিনেছি মাত্র বছরখানেক আগে,' আবার ছেলের প্রসঙ্গ চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার সেভারন 'খুব ভাল লাগে জায়গাটা। শান্ত, নীরব; কোন গোলমাল ছিল না, কিন্তু...'

অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকার পরও যখন মুখ খুললেন না মিস্টার সেভারন, না জিজ্ঞেস করে আর পারল না সে, 'কিন্তু কি, মিস্টার সেভারন? কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন, 'না না, কি ঘটবে?'

'মিস কেলেট আমাকে বললেন বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।'

অস্বস্তিভরা ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে তাকাতে লাগলেন মিসেস সেভারন। সত্যি যেন ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে আছেন।

হাসি ফুটল মিস্টার সেভারনের মুখে অবাক করল কিশোরকে।

'সব বাজে, বুঝলে। অতি কল্পনা। আমার স্ত্রী ভূতকে ভীষণ ভয় পায়।'

সলজ্জ হাসি ফুটল মিসেসের মুখে 'তুমিই তো ভয়ের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ভয়টা বাড়াও আমার।'

'কিন্তু ঘর নাকি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় মাঝে মাঝে,' কিশোর বলল।

'ঘরে রোদ না ঢুকলে তো হবেই,' জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলেন না

মিসেস সেভারন। 'এমনিতেই জায়গাটা বড় বেশি নীরব; দুপুরবেলায়ও গা ছমছম করে, তার ওপর···

'তার ওপর কি?' কিশোরের মনে হলো জরুরী কোন কথা বলতে চেয়েছিলেন মিসেস সেভারন বলতে দিলেন না মিস্টার সেভারন। 'বাদ দাও ওর কথা,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রসঙ্গটাকে হালকা করার জন্যে বললেন, 'আমার স্ত্রীর ভূতে আসর করা ঘরটা দেখবে নাকি?'

'দেখব না মানে! এক্ষুণি চলুন।'

'এসো,' হাসলেন মিস্টার সেভারন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ওকে দেখিয়ে আনি। তুমি ততক্ষণে বাসনগুলো ধুয়ে ফেলো।'

'আপনাদের কষ্ট করার দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'ধোয়াধুয়িগুলোও আমরাই করব। আমাদের দায়িত্ব···'

'কোন অসুবিধে নেই,' মিসেস সেভারন বললেন। 'বসেই তো থাকি। বরং কাজ করলে ভাল লাগবে। রান্না করে যে লাঞ্চ এনে খাওয়াচ্ছ, তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ; কত কাজ আর ঝামেলা বাঁচাচ্ছ।'

'ধোও তুমি, আমরা যাচ্ছি,' স্ত্রীকে বলে কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন। 'এসো।'

এই সময় বাইরে গাড়ির হর্ন বাজল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে তাকাল কিশোর। 'এইহে, মিস কেলেট চলে এসেছেন! আর কয়েক মিনিট দেরিতে এলে কি হত···' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল সে। মিস্টার সেভারনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'অন্য কোন সময় এলে কি ঘরটা দেখাবেন?'

'নিশ্চয় দেখাব যখন ইচ্ছে চলে এসো। এলে খুশিই হব। কথা বলার লোক পাই না।'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করল কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, রাখুন এটা। যদি কখনও কোন প্রয়োজন মনে করেন, ফোন করবেন।'

কার্ডটা দেখলেন মিস্টার সেভারন। 'কিশোর গোয়েন্দা!···খুব ভাল।' মুখ তুলে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু প্রশ্নবোধকগুলো কেন? আত্মবিশ্বাসের অভাব?'

এই প্রশ্নটা বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছে কিশোর। দমল না। বলল, 'মোটেও না। বরং আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি আমাদের। প্রশ্নবোধকগুলো বসানোর তিনটে কারণ। এক, রহস্যের ধ্রুবচিহ্ন এই প্রশ্নবোধক। যে কোন রহস্য সমাধানে আগ্রহী আমরা। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই। দুই, চিহ্নগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। আর তিন, যেহেতু দলে তিনজন, তাই তিনটে চিহ্ন দেয়া হয়েছে।' একটু থেমে বলল, 'কারও কাজ করে দেয়ার জন্যে পয়সা নিই না আমরা। গোয়েন্দাগিরি করাটা আমাদের শখ।'

দুই

'তারমানে ঘরটা দেখতে পারলে না!'

কিশোরের মতই নিরাশ হলো মুসাও। বেড়ায় হেলান দিল। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসে আছে ওরা।

'আরেকবার গেলেই হয়,' রবিন বলল। 'বলে তো এসেছই।'

'হ্যাঁ। যাব।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'ওই ভূতের ঘর দেখতে!'

হাসল কিশোর, 'এইমাত্র না দেখে আসতে পারলাম না বলে দুঃখ করলে?'

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আমি যাই। ফায়ারকে অনেকক্ষণ খাবার দেয়া হয়নি। খিদে পেলে চেঁচিয়ে, মাটিতে লাথি মেরে পাড়া মাত করবে। মা শেষে রেগে গিয়ে আমাকে সহ কানটি ধরে বের করে দেবে বাড়ি থেকে।' পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে মোড়ক খুলল সে। মট মট করে দুই টুকরো ভেঙে তুলে দিল দুজনের হাতে। বাকিটা মুখে পুরে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'তাহলে যাচ্ছই ভূত দেখতে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

'কাল সকালে।'

'সকালে আমার গিটারের ক্লাস আছে,' রবিন বলল। 'তারপর যাব লাইব্রেরিতে। দুপুরের পর হলে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে। দুপুরের পরই যাব।'

মুসা আর রবিন চলে যাওয়ার পর দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। ডেস্কের অন্যপাশে তার চেয়ারে এসে বসল। টেবিলে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা বই, একটা রহস্য কাহিনী : দি মিস্টরি অভ দা রেড জুয়েলস। কিছুটা পড়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

শেষ হওয়ার বহু আগেই বুঝে ফেলল চোর কোন্ লোকটা। আর পড়ার কোন মানে হয় না। বিরক্ত হয়ে বইটা রেখে দিল। রহস্য কাহিনী পড়তে গেলেই এই অবস্থা হয় তার। আগেই বুঝে ফেলে। ব্যস, মজা শেষ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা আর্টিকেল লেখার কথা। হাতে সময় আছে। এখন বসতে পারে। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে করছে না। একে তো ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা কেরি জনসনের সঙ্গে বনাবনতি নেই, তার ওপর বিষয় যেটা ঠিক করে দেয়া হয়েছে সেটাও

একেবারে পচা–শহুরে মানুষের ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা এবং ফুটপাথ সমস্যা। এ জিনিস নিয়ে যে কেউ ভাবতে পারে, ভাবলেও অবাক লাগে তার। তথ্য জানার জন্যে লাইব্রেরি থেকে খুঁজেপেতে একটা বই নিয়ে এসেছে সে। সঙ্গে রকি বীচের একটা ম্যাপ।

স্যারকে কথা যখন দিয়েছে লিখবে, লিখতেই হবে। খানিকক্ষণ উসখুস করে কাগজ-কলম টেনে নিল সে। এই সময় বাঁচিয়ে দিল তাকে টেলিফোন।

তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল, 'হালো!'

'কিশোর?'

মিসেস সেভারনের গলা। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। ঢিলেঢালা ভাবটা চলে গেল। 'হ্যাঁ, বলছি!'

'কিশোর,' ফিসফিস করে বললেন বৃদ্ধা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছেন যেন, 'একটা কথা···'

'বলে ফেলুন!' উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে কিশোরের স্নায়ু।

'দুপুরে···' ভীত মনে হচ্ছে মিসেস সেভারনকে। 'আসলে···'

কথা শেষ করতে পারলেন না। একটা ধমক শুনতে পেল কিশোর।

'এমন করছ কেন, জন!' মিসেস সেভারনের কাতর কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিশোরকে বললে ক্ষতি কি?'

আবার শোনা গেল ধমক। মিস্টার সেভারন কি বললেন, রিসিভারে কান চেপে ধরেও বুঝতে পারল না কিশোর।

'কিশোর,' আবার লাইনে ফিরে এলেন মিসেস সেভারন, 'সরি, বিরক্ত করলাম। পরে কথা বলব···রাখি, গুডবাই।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, মিসেস সেভারন!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কট করে শব্দ হলো। রিসিভার নামিয়ে রাখা হয়েছে অন্যপাশে।

একটা মুহূর্ত নিজের হাতে ধরা রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল। ম্যানিলা রোডের ওই বাড়িটাতে রহস্যময় কোন ঘটনা যে ঘটছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর তার।

*

'আরে এসো না, পায়ে জোর নেই নাকি তোমাদের!' ফিরে তাকিয়ে বলল মুসা। সাইকেল থামিয়ে এক পা মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। সেভারনদের বাড়িতে চলেছে। আগের দিন বলেছিল যাবে না, কিন্তু রবিন আর কিশোর রওনা হতেই আর সঙ্গে না এসে পারেনি।

'এত তাড়াতাড়ি চালাও কেন, বলো তো!' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'তোমার গায়ে নাহয় জোর বেশি, আমাদের তো আর নেই।'

বেশ গরম পড়েছে। মুখ লাল হয়ে গেছে তার।

হাসল মুসা। 'সেজন্যেই তো বলি, ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দাও। শরীরটাকে ফিট করে ছেড়ে দেবে।'

'কে যায় এত কষ্ট করতে···'

'তাহলে শরীরও ফিট হবে না।'

'কি বকবক শুরু করলে! সময় নষ্ট,' প্যাডালে চাপ দিল কিশোর। 'চলো।'

ম্যানিলা রোডে সেভারনদের বাড়ির সামনে পৌঁছল ওরা। সামনের রাস্তাটা বাদেও বাড়ির পাশ দিয়ে ঘাসে ঢাকা আরেকটা মোটামুটি চওড়া রাস্তা চলে গেছে একটা ছোট আপেল বাগানে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আঙুরের ঝোপ। তার ওপাশে বুনো গাছপালার জঙ্গল। বাতাসে দুলছে ফুলে ভরা ডালগুলো।

কাঠের গেটের পাশে বেড়ার গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখল ওরা। বাগানের দিকের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেল। সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

'খুলবে বলে তো মনে হচ্ছে না,' তৃতীয়বার দরজায় টোকা দেয়ার পরেও সাড়া না পেয়ে বলল কিশোর। 'ভুল হয়ে গেছে। আমরা যে আসছি, ফোন করে জানিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'বাইরে বেরিয়ে যায়নি তো?' একটা ফুলের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল মুসা। পর্দা টানা থাকায় কিছুই দেখতে পেল না।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'বাইরে যেতে পারে না বলেই খাবার দিয়ে যেতে হয় ওদের। বাইরে বেরোনোর সমস্যা আছে।'

মুসার হাত ধরে টান দিল রবিন, 'সরে এসো। এভাবে তোমাকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলে আরও ঘাবড়ে যাবে ওরা।'

সরে এল মুসা 'পেছন দিক দিয়ে গিয়ে দেখি আছে নাকি।'

কিন্তু পেছনে এসেও কাউকে দেখতে পেল না সে। কয়লার বাক্সারের ওপর গলা বাড়িয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। খালি। বাগানের ছাউনির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল সাদা রঙ করা সুন্দর একটা ভিক্টোরিয়ান সামার-হাউসের সামনে। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। কয়েকটা সাধারণ টুকিটাকি জিনিস ছাড়া মেঝেতে বিছানো রয়েছে পোকায় কাটা একটা পুরানো কার্পেট, দুটো ধুলো পড়া পুরানো ডেকচেয়ার, আর আপেল রাখার কয়েকটা কাঠের বাক্স। বাক্সগুলো খালি। বহু বছর এখানে কেউ ঢুকেছে বলে মনে হলো না।

বাগানের শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে গেল সে। বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল তাকিয়ে রইল একপাশের সবুজ তৃণভূমির দিকে। রঙবেরঙের প্রজাপতি আর বড় বড় ভোমরা উড়ে বেড়াচ্ছে ফুল থেকে ফুলে। বাটারকাপ, অক্স-আই ডেইজির ছড়াছড়ি। আর রয়েছে লম্বা, ব্রোঞ্জ রঙের এক ধরনের বুনো ঘাস। দারুণ জায়গা! ফায়ারকে এনে ছেড়ে দিলে মন মত চরে খেতে পারবে।

হঠাৎ একটা ঝিলিক দেখতে পেল মাঠের কিনারের বনের মধ্যে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সে। কিসের আলো? টর্চ? মনে হয় না। বাচ্চারা হয়তো খেলা করছে কোন ধাতব জিনিস বা কাঁচে প্রতিফলিত হয়েছে রোদ।

ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করে দেবার আগেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। গলায় ঝোলানো জিনিসটা দূর থেকেও চিনতে

পারল মুসা। দূরবীন।

একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। বোধহয় মুসাকে দেখল তারপর আবার চলে গেল গাছের আড়ালে। দূরবীনের কাঁচে লেগে ঝিক করে উঠল রোদ।

কে লোকটা? কটেজের ওপর চোখ রাখছিল কেন? ভাবতে ভাবতে কটেজের পাশ ঘুরে সামনের দিকে এগোল মুসা।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মিস্টার সেভারন। মুসাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাই, ছেলে, কে তুমি?'

'ও মুসা, মিস্টার সেভারন,' তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল কিশোর। 'আমাদের সঙ্গেই এসেছে। সামনের দরজায় সাড়া না পেয়ে পেছন দিক দিয়ে দেখতে গিয়েছিল।'

'ও, তুমিই মুসা।' ধূসর চুলে আঙুল চালালেন তিনি 'তিনজনেই এসেছ জানতাম না…'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। মিস্টার সেভারনের হাতটা ধরে রেখে চোখের ইশারায় চারপাশটা দেখিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর জায়গা। ঘোড়দৌড়ের প্র্যাকটিস করার জন্যে এরচেয়ে ভাল আর হয় না।'

মুসার হাতটা ছেড়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। 'হ্যাঁ। তবে ওখানে যেতে হলে,' তৃণভূমিটা দেখিয়ে বললেন, 'আমার জায়গার ওপর দিয়ে ছাড়া যেতে পারবে না। ঘোড়া চলাচলের একটা রাস্তা আছে বনের ভেতর দিয়ে। রাইডিং স্কুলের ছেলেরা মাঝে মাঝেই আসে এখানে ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস করতে।' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন তিনি, 'ঘোড়ায় চড়তে ভাল লাগে মনে হয় তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'লাগে। আমার নিজেরই একটা ঘোড়া আছে।'

'তাহলে তো ভালই। প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছে হলে চলে এসো যে কোন সময়। আগাম অনুমতি দিয়ে রাখলাম।'

'থ্যাংকিউ, মিস্টার সেভারন।'

'চলো, রাস্তাটা দেখিয়ে আনি তোমাকে।…দাঁড়াও, এক মিনিট, আমার ছড়িটা নিয়ে আসি।…কিশোর, রবিন, তোমরা ঘরে গিয়ে বসো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলো। কথা বলার মানুষ পেলে খুশি হবে ও, তোমাদের মত শ্রোতা পেলে।…কাল রাতের ঘটনাটা খুব রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারবে।'

'কাল রাতে আবার কি ঘটল?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

'সেটা তার কাছেই শুনো।'

ছড়ি নিতে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার সেভারন।

মুসার সঙ্গে বাগানের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেল কিশোর সামার-হাউসটা দেখে বলল, 'বাহ্, খুব সুন্দর তো।' কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। 'কিন্তু কেউ থাকে বলে তো মনে হয় না।'

কথাটা যেন মুসার কানেই গেল না। কিশোরের বাহু চেপে ধরল, 'কিশোর, একটা ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কি?'

'বনের মধ্যে একটা লোক···'

'মানে?'

'কটেজের ওপর চোখ রাখছিল।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। গলায় ঝোলানো একটা দূরবীন। আমাকে দেখেই লুকিয়ে পড়ল। সন্দেহ হলো সেজন্যেই।'

'কেমন দেখতে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'মুখ দেখিনি। লোকটা বেশ লম্বা। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা নরম হ্যাট। ওর কাজকারবার মোটেও ভাল লাগেনি আমার।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'হুঁ! হাঁটতে গেলে এখন সাবধান থাকবে। বুঝতে পারছি না, সেভারনদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে যাবে কে! তবে যদি রেখে থাকে, কোন কারণ নিশ্চয় আছে। তারমানে সেভারনদের যারা বন্ধু, তারা লোকটার শত্রু। আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। চোখকান খোলা রেখো।···ওই যে, মিস্টার সেভারন বেরিয়েছেন। তোমরা যাও। আমি আর রবিন মিসেস সেভারনের সঙ্গে কথা বলিগে। শুনি, কাল রাতে কি ঘটেছে।'

তিন

কটেজের সামনের ঘরে রবিনকে বসতে দিলেন মিসেস সেভারন।

'চা'টা আমিই বানিয়ে নিয়ে আসি, মিসেস সেভারন,' প্রস্তাব দিল রবিন।

রাজি হলেন না মিসেস সেভারন, 'না, আমিই পারব। অত দুর্বল ভেবো না আমাকে। তোমরা আরাম করে বসো।'

রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

কিন্তু বসে থাকতে ভাল লাগল না রবিনের। উঠে ম্যানটলপীসের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাকি সেভারনের ছবিটা দেখার জন্যে। পর্দা টানা থাকায় ঘরে আলো কম। ভাল করে দেখার জন্যে নামিয়ে আনতে গেল। কাত হয়ে কার্ডবোর্ডের মাউন্ট থেকে খসে পড়ে গেল ওটা। তাড়াতাড়ি তুলে নিল আবার। আড়চোখে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল মিসেস সেভারন দেখে ফেললেন কিনা।

ছবিটা আবার মাউন্টে ঢোকাতে গিয়ে ছবির নিচে প্রিন্ট করা তারিখটা চোখে পড়ল ওর। গত বছরের তারিখ ১০ আগস্ট।

ঘরে ঢুকল কিশোর।

ছবি রেখে তার কাছে সরে এল রবিন।

মুসা কি দেখেছে, রবিনকে জানাল কিশোর।

'সাবধান করে দিলে না ওকে?' দূরবীনধারী লোকটার কথা শুনে চিন্তিত

হলো রবিন।

'করেছি।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। পর্দা ফাঁক করে তাকাল। মাঠের কিনারে পৌঁছে গেছে মুসা আর মিস্টার সেভারন। নিচু হয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটল মুসা। হাত নেড়ে তৃণভূমির অন্যপ্রান্তে কি যেন তাকে দেখাতে চাইছেন মিস্টার সেভারন।

গলাটাকে বকের মত পাশে লম্বা করে দিয়েও কিছু দেখতে পেল না কিশোর। বাইরে না গেলে দেখা যাবে না। হতাশ ভঙ্গিতে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেভারন। তাঁকে সাহায্য করতে উঠে গেল রবিন।

আগের দিনের সোফাটায় বসল কিশোর। এক কাপ চা এগিয়ে দিল রবিন। কফি টেবিলটায় সেটা রাখতে গিয়ে গোটা তিনেক চিঠি চোখে পড়ল কিশোরের। একটাতে সেই বিচিত্র লোগো ছাপ মারা। বাকি দুটোতে ডাক বিভাগের সীল দেখে বোঝা যায় লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছে। ঠিকানায় মিসেস সেভারনের নাম। পেঁচানো হাতের লেখা।

হাত বাড়িয়ে একটা চিঠি তুলে নিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। অন্যের চিঠি দেখা ঠিক না। মিসেস সেভারন কিছু মনে করতে পারেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। মুখ তুলে তাকাল বৃদ্ধার দিকে। 'কাল রাতে নাকি কি ঘটেছে, মিসেস সেভারন?'

'হ্যাঁ।'

শোনার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। 'বলুন না, শুনি।'

লম্বা ঘাস মাড়িয়ে তখন বনের কাছে পৌঁছে গেছে মুসা আর মিস্টার সেভারন। ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। রাস্তাটা দেখতে পেল মুসা। পুরানো ওকের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে বেরিয়েছে একটা খোলা জায়গায়। পায়ের নিচে কার্পেটের মত বিছিয়ে আছে ঝরা পাতা।

'কাটতে না কাটতে রাস্তায় উঠে আসে কাঁটালতা, দুদিনও যায় না,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'ছাত্ররাই কেটে কেটে পরিষ্কার করে রাখে।'

কোন্ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কুহু-কুহু করে উঠছে একটা কোকিল। ওটার মিষ্টি স্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওকের ডালে বসা একটা দাঁড়কাক।

মিস্টার সেভারন জানালেন বহু শত বছর ধরে আছে এখানে বনটা।

'দারুণ জায়গা! ঘোড়া নিয়ে সত্যি আসতে পারব তো? কোন অসুবিধে হবে না?'

'না, হবে না। যখন খুশি চলে এসো।'

অদ্ভুত এই বনটার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে কেমন লাগবে ভাবতেও রোমাঞ্চিত হলো মুসা।

মিস্টার সেভারন বলে চলেছেন, 'এই এলাকার সবচেয়ে পুরানো বন এটা। লোকে এখনও বেড়াতে এসে মজা পায় এখানে। তবে কদ্দিন পরে আর জানি না। যে হারে কাটাকাটি শুরু হয়েছে...আমি যখন যুবক ছিলাম, তখনও অনেক বড় ছিল ওই বন। মাঠের ওপাশটাতেও ঘন বন ছিল সব তো কেটে সাফ করেছে।'

'ওই যে নতুন স্পোর্টস সেন্টার আর শপিং সেন্টার খুলেছে ওটার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ হয়ে গেল মিস্টার সেভারনের দৃষ্টি 'আর কিছুদিন পর খোলা জায়গা বলতে কিছু থাকবে না। সব বাড়িঘর দিয়ে ভরে ফেলবে।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা সরু রাস্তা চোখে পড়ছে। তাতে একটা সাদা রঙের ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা

'কার গাড়ি?' মিস্টার সেভারনও দেখেছেন। 'এ রকম জায়গায় তো গাড়ি পার্ক করে না কেউ।'

'একটু আগে একটা লোককে দেখেছি আমি। দূরবীন দিয়ে আপনাদের বাড়ির ওপর চোখ রাখছিল।'

থমকে দাঁড়ালেন মিস্টার সেভারন। 'কি বলছ! চলো চলো, ফিরে যাই। মিসেস সেভারনকে একা ফেলে এসেছি!'

তাঁর উদ্বেগ দেখে অবাক হলো মুসা 'একা কোথায়? কিশোর আর রবিন আছে। কেউ কিছু করতে পারবে না তাঁর

মুসার কথা শেষও হলো না, বনের মধ্যে গুলির শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠল মুসা। এত কাছে কে গুলি করছে? শব্দ লক্ষ করে সে ঘুরতেই দেখতে পেল লোকটাকে। চোখের পলকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ছায়ার মত।

'এখানে কি শিকারের অনুমতি আছে?' জানতে চাইল সে

মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন। ভুরু কোঁচকালেন। 'না। কে গুলি ছুঁড়ছে বুঝতে পারছি না। ওই ভ্যানে করেই এসেছে মনে হচ্ছে ভ্যানের ছাতে চড়ে বেড়া ডিঙানো সম্ভব।'

আবার গুলির শব্দ। স্মুই ভেলোসিটি শটগান থেকে ছোঁড়া হচ্ছে। অতিরিক্ত কাছে।

ভয় লাগছে মুসার। 'এখানে থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না আমার। কোন্ সময় এসে গায়ে লাগে!'

গাছের ফাঁকে আবার ছায়ামূর্তিটাকে চোখে পড়ল মুসার। কাঁটাঝোপের কাছে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। হাতের বন্দুকের নল এদিকে ফেরানো।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে বন্দুকের বাঁট ঠেকিয়ে নিশানা করল লোকটা।

মিস্টার সেভারনের হাত ধরে টান দিল মুসা, 'চলুন। লোকটার ভাবসাব সুবিধের লাগছে না আমার।'

তৃতীয়বার গুলির শব্দ হলো। ওদের মাথার ওপরের ডালে ছরছর করে এসে লাগল ছররা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল দু'জনে।

'পাখি তো কই, উড়ছে না,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমাদেরকেই নিশানা করছে না তো?'

হাতটা ধরে রেখেই বুঝতে পারছে সে, মিস্টার সেভারন কাঁপতে শুরু করেছেন। মাথা নেড়ে কম্পিত গলায় বললেন, 'মনে হয় না!'

'চুপ করে থাকুন। তাহলে ও মনে করবে আমরা চলে গেছি। হয়তো আর গুলি করবে না।'

ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইল দু'জনে। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে মুসার হৃৎপিণ্ডটা। ভয় হতে লাগল, সেই শব্দও শুনে ফেলবে লোকটা। ঝোপঝাড় ভেঙে কে যেন এগিয়ে আসতে লাগল।

ওদের ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল একজোড়া বুট। পা ফাঁক করে দাঁড়াল। পায়ের সামনে তেরছা ভাবে এসে পড়ছে সূর্যরশ্মি। পকেট থেকে আরও দুটো কার্তুজ বের করে বন্দুকে ভরল সে। ধীরে ধীরে বন্দুক তুলে নিশানা করল ওদের দিকে।

চার

দম আটকে ফেলল মুসা। চারপাশটা বড় বেশি নীরব। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল আবার লোকটার দিকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে কাউকে।

একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মুসা। গাছের গায়ে লেগে ঝোপের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল পাথরটা।

আবার ঝোপঝাড় ভেঙে সেদিকে ছুটল লোকটা। কাঁটাঝোপে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। চাপা গোঙানি শোনা গেল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার দিল দৌড়।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার সেভারনকে হাত ধরে টেনে তুলল মুসা। যে পথে এসেছিল, তাঁকে নিয়ে সেই পথটা ধরে ছুটল কটেজের দিকে। ঝোপের ধারে দুটো কার্তুজের খোসা পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নিল। এখনও গরম। পরে ভাল করে দেখবে ভেবে ঢুকিয়ে রাখল জিনসের পকেটে।

'মিস্টার সেভারন, পুলিশকে জানানো দরকার এখনই। ওই লোকটা পাগল।'

মুসাকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন। 'না। আমি পুলিশের কাছে যাব না।'

'কিন্তু আরেকটু হলেই আমাদের খুন করে ফেলেছিল! ঘোড়ায় চড়ে আসাটা তো এখানে বিপজ্জনক। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে গেলে পিঠ থেকে সওয়ারী উল্টে ফেলে পালানোর চেষ্টা করবে ঘোড়া। মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে। লোকটা ভীষণ বিপজ্জনক।'

তার পরেও পুলিশের কাছে যেতে রাজি হলেন না মিস্টার সেভারন।

জ্যাকেটে লেগে থাকা শুকনো পাতা ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'লোকটা চলে গেছে এতক্ষণে। আমার ধারণা, ভুল করেছে সে। হরিণ-টরিণ বা ভালুক ভেবে আমাদের গুলি করেছে।'

'তাহলেও মস্ত অপরাধ করেছে সে, কারণ এখানে শিকার করা বেআইনী। তার ভুলের জন্যে মারাত্মক জখম হতে পারতাম আমরা। এ ভাবে যেখানে সেখানে গুলি চালানোর জন্যে তো আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয় না। পুলিশকে না জানালে এখন সেটা আমাদের অপরাধ বলে গণ্য হবে।'

বন থেকে বেরিয়ে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে রবিন।

'কি হয়েছে?' দূর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'গুলির শব্দ শুনলাম।'

'একটা উন্মাদ আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিল,' জবাব দিল মুসা।

'কেন?' কাছে চলে এসেছে রবিন।

'ভুল করেছে,' মুসাকে কথা বলতে দিলেন না মিস্টার সেভারন। 'শটগান থেকে গুলি ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করছিল বোধহয়।' দুই আঙুলে টিপে ধরে কাপড় থেকে আরেকটা পাতা তুলে ফেলে দিলেন তিনি। 'কোন ক্ষতি হয়নি আমাদের।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা বলে চালাতে চাইছেন মিস্টার সেভারন।

ছড়িতে ভর দিয়ে দিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।

রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা, 'রবিন, একটা লোক সত্যি সত্যি আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।'

'তোমাকে নয় নিশ্চয়; ভয়টা আসলে দেখাতে চেয়েছে মিস্টার সেভারনকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'এমনিতেই তো যথেষ্ট ভয়ের মধ্যে আছেন তাঁরা, আর কত?'

সব শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিসেস সেভারনের।

'আরও যে কত কি ঘটবে খোদাই জানে!' দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন তিনি। 'কাল রাতে এ রকম একটা ব্যাপার···তারপর এখন এই! টিকতে দেবে না!'

'কাল রাতে কি হয়েছিল?' জানতে চাইল মুসা।

'ভূতের উপদ্রব আছে যে ঘরটায়,' জবাব দিল কিশোর, 'সেটাতে নাকি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছেন মিসেস সেভারন।'

'ভয়ানক শব্দ!' মিসেস সেভারন বললেন। 'মনে হলো নাকি স্বরে কাঁদছে কেউ, তারপর আবার খিলখিল করে হাসছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কি সব বলছে।'

'জিনিসপত্রও নাকি তছনছ করেছে,' কিশোর বলল।

'ছায়ামূর্তিটার কথা বাদ দিচ্ছ কেন?' রবিন বলল।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অধৈর্য কণ্ঠে বললেন মিস্টার সেভারন, 'তারমানে বলে দিয়েছ ওদের! এ সব অতি কল্পনা···'

'না, কল্পনা নয়,' রেগে উঠলেন মিসেস সেভারন, 'আমি দেখেছি ওটাকে! কোন ভুল ছিল না। ফিনফিনে পোশাক পরা কুয়াশার মত একটা ধূসর মূর্তি হালকা পায়ে ছুটে গেল লনের ওপর দিয়ে।'

বোঝানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার সেভারন, 'দেখো, কুয়াশার মধ্যে চাঁদের আলোয় অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরি হয়, বাতাসে কুয়াশা উড়ে বেড়ানোর সময় মনে হয় মানুষ হাঁটছে···'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মিসেস সেভারন বললেন, 'না, আমি যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। চাঁদের আলোয় কুয়াশায় কি হয় না হয় জানা আছে আমার।'

স্বামী-স্ত্রীর তর্কটা বন্ধ করার জন্যে কিশোর বলল, 'ঘরটা আমাদের দেখাবেন বলেছিলেন?'

'তা তো দেখাবই। নিশ্চয় দেখাব,' মিসেস বললেন। 'তোমরা গোয়েন্দা। দেখো, কিছু বুঝতে পারো নাকি।'

ওদের নিয়ে চললেন তিনি। ভূতুড়ে ঘরটা রয়েছে বাড়ির পেছন দিকে, রান্নাঘরের পরে।

'বাড়ির সবচেয়ে পুরানো অংশ এটা,' সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন মিস্টার সেভারন। 'স্থানীয় একজন মিস্ত্রি বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, মিস্টার জারভিস যখন থাকতেন। আমাদের আগের মালিক মিস্টার জারভিস, তাঁর কাছ থেকেই বাড়িটা কিনেছি। পেছনের এই দিকটা তেমন ব্যবহার করি না আমরা। জ্যাকি এ ঘরটাকে তার স্টাডি বানিয়েছিল। এখানকার জিনিসপত্র বেশির ভাগই তার। কিন্তু···' থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'ভূত নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না তার।'

দরজা খুললেন মিসেস। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল গোয়েন্দাদের গায়ে। শীতের বাতাসের মত।

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। কিশোরের হাত খামচে ধরল।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। 'ভয় পাচ্ছ?'

নীরবে মাথা নাড়ল মুসা।

'এ ঘরে আসতে আমার ভাল লাগে না,' কেঁপে উঠলেন মিসেস সেভারন। গায়ে কাঁটা দিল মনে হলো। 'জ্যাকি চলে যাওয়ার পর এটাকে সেলাইয়ের ঘর বানিয়েছিলাম আমি। কিন্তু এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, হাড়ের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে যায় আমার।'

সাবধানে ঘরে পা রাখল তিন গোয়েন্দা। কেঁপে উঠল কিশোর। তার টি-শার্ট আর সুতির প্যান্ট ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। বাইরে কড়া রোদ থাকা সত্ত্বেও ঘরটার মধ্যে ডিসেম্বরের বিকেলের মত ঠাণ্ডা।

'বাপরে! সত্যি ঠাণ্ডা!' রবিন বলল।

'রোদ লাগে না কোন দিক দিয়ে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'ঘরের মধ্যে নেই কোন ধরনের হীটিং সিসটেম। শীতকালে যে আর্দ্রতা ঢোকে, সেটা আর বেরোতে পারে না। সারা বছর সেঁতসেঁতে হয়ে থাকে। গরম হবে

কোত্থেকে।'

'আগুন জ্বেলেও গরম করার চেষ্টা করে দেখেছি,' মিসেস বললেন। 'কাজ হয়নি। যে ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডা।'

'নিচে একটা পুরানো সেলার আছে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'সেটাতে আছে চিমনি। সেই চিমনি দিয়ে নিচের ঠাণ্ডা ওপরে উঠে আসে।'

'আগের মালিক কিছু জিনিসপত্র ফেলে গেছেন,' হাত তুলে দেখালেন মিসেস সেভারন। 'ওই যে কার্পেটটা, ওটা ছিল তাঁদের। নতুন বাড়ি করে চলে গেছেন, তাতে এ জিনিস মানাবে না–বেশি পুরানো আমলের, তাই ফেলে গেছেন। আর ওই বুকশেলফটাও...'

কিশোর দেখল, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে কতগুলো বই। দেয়াল থেকে খুলে পড়েছে একটা ছবি। কেউ ফেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে। পুরানো কার্পেটটা মেঝের বেশির ভাগ অংশই ঢেকে রেখেছে, জায়গায় জায়গায় দুমড়ানো। টেনে সোজা করে দেয়ার জন্যে নিচু হলো সে।

'অবাক কাণ্ড!' কিশোরকে দোমড়ানো জায়গাগুলো সমান করতে দেখে মিসেস সেভারন বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ওটা পেরেক দিয়ে লাগানো। সোজা হবে না। কুঁচকালও, সোজাও হচ্ছে আবার!'

মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলো তুলে সেলাইয়ের জিনিসপত্র রাখার বাক্সে রাখল রবিন। কিশোরকে সাহায্য করার জন্যে কার্পেটের একদিক ধরে টান দিল। নড়ল না। মেঝের তক্তার সঙ্গে আটকানো রয়েছে এদিকটা। বাক্সটা দিল মিসেস সেভারনের হাতে।

'গির্জায় যারা বিয়ে করতে আসে, তাদের পোশাক বানাতাম আমি,' মিসেস সেভারন বললেন। 'এখন আর পারি না। কাজ করতে গেলেই আঙুল কেমন আঁকড়ে আসে।'

'আশ্চর্য!' ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বলল কিশোর। দেয়ালের কাঠের রঙ গাঢ় বাদামী। চেহারাটা কেমন বিষণ্ন করে দিয়েছে ঘরটার। 'দেখলে অবশ্য ভূতুড়েই মনে হয়।'

'তুমি বলছ এ কথা!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'ভূতুড়ে লাগলেই যে ভূত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।'

'ভূতুড়ের মানে কি তাহলে?'

জবাব দিল না কিশোর।

জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার সেভারন। মিসেস দলে ভারী হয়ে যাচ্ছেন দেখে যেন হতাশ হয়েছেন।

'আপনি বিশ্বাস করেন না এ সব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন।

'মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল কি করে? কেউ তো নিশ্চয় ফেলেছে।'

তাঁর হয়ে জবাবটা দিয়ে দিল রবিন, 'ভূমিকম্পেও পড়তে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তো আর ভূমিকম্পের অভাব হয় না, যখন তখন কেঁপে ওঠে

মাটি।'

'তাহলে বাকি ঘরগুলোর জিনিস মাটিতে পড়ল না কেন?' প্রশ্ন করলেন মিসেস সেভারন।

শুকনো হাসি হাসলেন মিস্টার সেভারন। 'বিশ্বাসই যখন করো, আসল কথাটাই বলে দাও ওদের।'

'আসল কথা?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'জোয়ালিন।'

'জোয়ালিন!' পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। মিস্টার সেভারনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'জোয়ালিনটা কে?'

এক এক করে তিনজনের দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন। লম্বা দম ছাড়লেন। তারপর বললেন, 'ভূত!'

পাঁচ

আবার দৃষ্টি বিনিময় করল গোয়েন্দারা।

মুসা ভাবছে, সত্যি সত্যি তাহলে বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রব আছে! একটা মেয়ের ভূত রাত দুপুরে সত্যি ঘুরে বেড়ায় বাড়িময়!

ওদের দিকে তাকিয়ে কোনমতে মুখে হাসি ফোটালেন মিসেস সেভারন। তারপর ফিরলেন স্বামীর দিকে। 'গল্পটা শুনিয়েই দাও না ওদের।'

চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার সেভারন। 'এই কটেজটা এক সময় অনেক বড় ছিল। আঠারোশো শতকে তৈরি করা একটা দুর্গের অংশ এটা। এই ঘরটা ছিল বিশাল ডাইনিং রুমের অংশ। মালিক ছিল ওয়ারনার নামে এক ধনী লোক। ওদের একমাত্র মেয়ে জোয়ালিন। অপূর্ব সুন্দরী। জন্মেছিল নববর্ষের দিনে। মা-বাবার চোখের মণি।'

'ভূতে ধরল কি করে তাকে?' ফিসফিস করে বলল মুসা। ভয়ও পাচ্ছে, কৌতূহলও দমন করতে পারছে না।

'শোনোই না!' রবিন বলল।

'এক জিপসি যুবকের প্রেমে পড়েছিল সে,' মিস্টার সেভারন বললেন।

চেপে রাখা দমটা আস্তে করে ছাড়ল রবিন। 'বাহ্, বেশ রোমান্টিক তো!'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'রোমান্টিক দেখলে কোথায়? এ তো ডবল ভূতের আলামত!'

মিস্টার সেভারন বললেন, 'তার বাবার ধারণা ছিল, ওদের কা-পয়সা দেখেই মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে যুবক। ওসবের লোভে। তা ছাড়া সামান্য এক জিপসি যুবককেও পছন্দ করতে পারছিল না সে। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়েও মেয়েকে ফেরাতে না পেরে শেষে ঘরে তালা দিয়ে রাখল।'

'সেই পুরানো কাহিনী!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'বড়লোক বাপ তার

মেয়েকে কোনমতেই এক ছন্নছাড়ার হাতে তুলে দিতে চায় না। অতএব দুর্ঘটনা! তাই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। 'বাপের ওপর অভিমান করে মেয়ে কোন খাবারই স্পর্শ করল না; না খেয়ে খেয়ে মারা গেল।'

'এই ঘরের মধ্যে!' আঁতকে উঠল মুসা। চারপাশে তাকাতে লাগল এমন ভঙ্গিতে, যেন এখনই ভূতটা বেরিয়ে এসে ঘাড়ে চাপবে ওর।

'না, এখানে না, অন্য আরেকটা ঘরে; বহু আগেই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে ওটা। দুর্গে আগুন লেগেছিল। তবে, এ ঘরে না মরলেও,' ওদের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে বললেন মিস্টার সেভারন, 'এখানে রাতের বেলা চুরি করে জোয়ালিনের সঙ্গে দেখা করতে আসত যুবক।'

'খাইছে!' মুসার ভঙ্গি দেখে মনে হলো সময় থাকতে উঠে চলে যাবে কিনা ভাবছে।

'জোয়ালিনের আর কোন ভাই-বোন ছিল না। তার মৃত্যুর পর খুব বেশিদিন আর বাঁচেনি তার বাবা-মা। পুরো পরিবারটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লোকে বলে, জোয়ালিন এখনও তার প্রেমিকের অপেক্ষায় আছে। রাতের বেলা নাকি বেরিয়ে পড়ে তারই খোঁজে।'

গল্প শেষ হওয়ার পরে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

ঘোরের মধ্যে থেকে যেন বলে উঠল রবিন, 'বেচারি!'

'কি সব মানুষ!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা, 'খাবার নিয়ে আবার কেউ গোস্সা করে নাকি? মরার যেন আর কোন উপায় খুঁজে পেল না!'

'না খেয়েই নাহয় মরল,' মিস্টার সেভারন বললেন, 'কিন্তু তাতেই কি ভূত হয়ে যেতে হবে নাকি? আসলে এ রকম ইমোশনাল গল্প ভালবাসে লোকে, সেজন্যেই তৈরি করে।'

'তবে,' কিশোর বলল, 'মিসেস সেভারন যদি রাতের বেলা কিছু দেখেই থাকেন, তার কোন একটা বাস্তব ব্যাখ্যা নিশ্চয় রয়েছে।'

রবিন বলল, 'আপনাদের কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছে।'

চট করে পরস্পরের চোখের দিকে দৃষ্টি চলে গেল বুড়ো-বুড়ির, কিশোরের চোখ এড়াল না সেটা।

'এস্টেট থেকে আসা পোলাপানগুলো হতে পারে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'ওদেরকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি আমি। নিশ্চয় ভূতের গুজবটা ওরা শুনেছে। রাতে ভয় দেখাতে এসেছে আমাদের।'

মেঝেতে পড়ে থাকা একটা বই তুলে নিল কিশোর। মলাট ওল্টাল। সাদা পাতাটায় পেঁচানো অক্ষরে লেখা রয়েছে একটা নাম—জ্যাকুয়েল সেভারন। চিঠির ঠিকানার হাতের লেখা আর এই লেখার সঙ্গে মিল রয়েছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'তারমানে ওরা ভাল ছেলে না। ভাল হলে রাতের বেলা অন্যের বাড়িতে ঢুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করত না। ওরা আরও খারাপ কিছু করতে পারে। চুরিদারি, কিংবা যা খুশি। সাবধান থাকতে হবে আপনাদের। জানালায়ও তালা লাগাতে হবে। পুরানো আমলে তৈরি এ সব

জানালা সহজেই বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়

'হ্যাঁ,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলেন মিস্টার সেভারন।

ঘর দেখা হয়েছে। সারি বেঁধে বেরোনোর সময় জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'গুজবটা কি সবাই জানে নাকি এদিকের?'

'জানে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। 'আগের মালিক তো তার বাড়িতে যে ভূত আছে এটা নিয়ে গর্বই করত। আমরা বাড়িটা কেনার আগে জ্যাকি যখন দেখতে এসেছিল, সব বলেছিল তাকে জারভিস। জ্যাকি গিয়ে সবখানে গপ মেরে ছড়িয়েছে, তার বাবা একটা ভূতুড়ে বাড়ি কিনতে যাচ্ছে। বলেছে হয়তো মজা করার জন্যেই, কিন্তু...'

এই সময় বাড়ির বাইরে থেকে ডাক দিল কে যেন। জানালার পর্দা সরাতে দেখা গেল ডাক পিয়ন। দরজার নিচ দিয়ে কয়েকটা চিঠি ঠেলে দিয়ে চলে গেল সে।

তুলে নিলেন মিস্টার সেভারন। ঠিকানাগুলো পড়তে লাগলেন। উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে।

কৌতূহলী হয়ে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর। একটা চিঠিতে দেখল সেই একই রকম লোগো। 'এস' আর 'এইচ' অক্ষর দুটো একটার সঙ্গে আরেকটা পেঁচিয়ে লিখে তৈরি করা হয়েছে লোগোটা।

'ওদের চিঠিও আছে?'

'কাদের' চিঠি, নামটা ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেলেন মিসেস সেভারন।

মিস্টার সেভারনও একই রকম চেপে যাওয়া ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

চিঠিগুলো হলের টেবিলে রেখে দিলেন তিনি

'ও আমাদের ছাড়বে না!' বিড়বিড় করে বললেন মিসেস সেভারন।

*

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিন গোয়েন্দাকে বিদায় জানালেন দু'জনে।

রাস্তা দিয়ে কয়েকশো গজ এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখল একটা দেয়ালে। দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? কে কি সূত্র পেলে?'

'আমি পেয়েছি,' রাগত স্বরে বলল মুসা, 'একটা খুনীকে! বনের মধ্যে আরেকটু হলেই ফুটো করে দিয়েছিল আমাকে।' পকেট থেকে কার্তুজের খোসা দুটো বের করল মুসা। 'এই দেখো। তুলে নিলাম যখন, তখনও গরম ছিল।'

একটা খোসা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর, 'একটু অন্য রকম।'

'মানে?' কিশোরের হাত থেকে খোসাটা নিয়ে রবিনও দেখতে লাগল।

'চাচা একবার একটা পুরানো বন্দুক কিনে এনেছিল, কয়েক বাক্স পুরানো গুলি সহ,' কিশোর বলল। 'গুলিগুলো এ রকম ছিল। চাচা বলেছে, ঘরে বানানো গুলি ছিল ওগুলো।'

কিশোরের হাতে খোসাটা ফিরিয়ে দিল রবিন। 'এ রকম গুলি কখনও দেখিনি আমি। কোন মন্তব্য করতে পারব না।'

'আমিও দেখিনি,' মুসা বলল।

'হুঁ,' ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'একটা লোক ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইল, দুটো গুলির খোসা পেলে; এ ছাড়া আর কিছু?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'না। লোকটার চেহারা দেখতে পারলে ভাল হত। পাতার জন্যে ওপরটা দেখা যাচ্ছিল না। কাছে এসে যখন দাঁড়াল, চোখে পড়ল শুধু গাঢ় রঙের জ্যাকেটের নিচের অংশ। জিনসের প্যান্ট ছিল পরনে। পায়ে বুট। আর দশজন সাধারণ মানুষের মত।'

'দূরবীন দিয়ে চোখ রাখছিল যে লোকটা, সে-ই তাহলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, 'আর কে হবে।'

'ইস্, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে!' ওর কাঁধে হাত রাখল কিশোর, 'গুলি যে লাগেনি তোমার গায়ে! সর্বনাশ হয়ে যেত!'

'হ্যাঁ, আমি মারা যেতাম,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল মুসা। 'এতিম হয়ে যেতে তোমরা।'

হাসল কিশোর।

ওকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তুমি কি জেনেছ?'

'কিছু চিঠি দেখেছি, তার মধ্যে দুটো চিঠি এসেছে কোন একটা কোম্পানি থেকে। লোগো দুটো এক। আরেকটা জিনিস অনুমান করছি–কেউ একজন হুমকি দিচ্ছে সেভারনদের?'

'হুমকি; তারমানে ব্ল্যাকমেল?'

'জানি না। মিসেস সেভারন কি বললেন শুনলে না? "ও আমাদের ছাড়বে না।" এই ও-টা কে?'

রবিন কোন জবাব দিতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'লোগোটা দেখতে কেমন?'

নোটবুক বের করে কলম দিয়ে তাতে 'এস' এবং 'এইচ' অক্ষর পেঁচিয়ে একটা ছবি আঁকল কিশোর। সেটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে, এই রকম। দেখেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল রবিন।

মুসাও মাথা নেড়ে বলল, 'না। কি এঁকেছ, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝা যাবে, পরে,' নোটবুকটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর, 'এ সব ছাড়াও ওবাড়িতে আছে একটা ভূতুড়ে ঘর। সারা ঘরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রেখে যাওয়ার ব্যাপারটা ইঙ্গিত করে, ওঁদের ভয় দেখাতে চাইছে কেউ। ঘরটা ভূতুড়ে হলেও কাজটা ভূতের নয়, এটা ঠিক।'

'জোয়ালিনের গল্প তুমি বিশ্বাস করছ না তাহলে?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'গল্প গল্পই। তবে ঘটনা যা ঘটছে, তাতে ভূতের হাত নেই, আছে জলজ্যান্ত মানুষের হাত। কেউ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে ফেলে

গেছে, কোন সন্দেহ নেই আমার তাতে।'

'তাহলে আমাদের জানতে হবে এখন,' রবিন বলল, 'সেই শয়তান লোকটা কে এবং কেন এই উৎপাত করছে।'

'ঠিক,' মুসা বলল।

'কিন্তু জানা যাবে কি করে?'

'সেকথায় পরে আসছি। তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই—লোগো ছাড়াও আরও কয়েকটা চিঠি দেখেছি আমি। ঠিকানার ওপর যে রকম হাতের লেখা, জ্যাকির বইতেও একই রকম লেখা দেখেছি। তারমানে...'

'চিঠিগুলো জ্যাকির কাছ থেকে এসেছে!' কথাটা শেষ করে দিল রবিন। উত্তেজিত মনে হলো তাকে।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, পোস্টমার্কও দেখেছি। যেখান থেকে চিঠিগুলো এসেছে সেখানকার পোস্টমার্ক।'

'কোনখান থেকে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেস।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনখান থেকে?'

'তা কি করে বলব?'

নিরাশ হলো রবিন। 'তাহলে আর লাভটা কি হলো! ঠিকানা না জানলে কিছু বের করা যাবে না।'

'জানব। শুরুতেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? সবে তো তথ্য পেতে আরম্ভ করেছি আমরা।'

পকেট থেকে চকলেট বের করে মোড়ক ছাড়াল মুসা। 'শান্ত থাকতে হলে চকলেটের বিকল্প নেই।' একটা টুকরো ভেঙে রবিনকে দিল সে। আরেকটা কিশোরকে। বাকিটা নিজের মুখে ফেলে চিবাতে শুরু করল।

চকলেট মুখে দিয়ে হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

হেসে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'দেখলে তো, মগজটা কেমন হালকা হয়ে গেল? চকলেটের বিকল্প নেই।'

চকলেট গালে ফেলে কিশোর বলল, 'বাড়ি যাওয়া দরকার। ওই পচা প্রবন্ধটা শেষ করে ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামানো যায় ততই মঙ্গল। হুঁহ, আর কাজ পেল না, পথিকদের নিয়ে প্রবন্ধ। নামটাও বাজে—ফুটপাথ এবং পথচারী!'

'সত্যি,' মুখ বাঁকাল মুসা, 'পচা সাবজেক্টই। তুমি না নিলেই পারতে।'

'কি করব না নিয়ে? যে ভাবে চাপাচাপি শুরু করল...'

'তা ঠিক। মিস্টার গোবরেডকে এড়ানোই মুশকিল। বাঁচলাম। আমি এ সব লেখালেখির মধ্যেও নেই, আমাকে গছাতেও পারবে না...'

সাইকেলটা রাস্তায় এনে উঠে বসল কিশোর। রবিন আর মুসাও চড়ল যার যারটায়। এগিয়ে চলল আবার।

পথের মোড়ে হঠাৎ দেখা গেল সাদা একটা ভ্যান। টায়ারের আর্তনাদ তুলে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে।

'খাইছে!' বলেই ব্রেক কষে গতি কমিয়ে ফেলল মুসা। 'ভ্যানটাকে দেখেছি!'

'কোথায়?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'বনের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আর মিস্টার সেভারন দু'জনেই দেখেছি।'

সাবধান হয়ে গেল কিশোর। মুসার কথা শুনে নয়, গাড়িটাকে অস্বাভাবিক দ্রুত ছুটে আসতে দেখে। সরু রাস্তায় আরও যে যানবাহন আছে কেয়ারই করছে না যেন গাড়িটা। গতি বাড়াচ্ছে বরং। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এঞ্জিনের শব্দে চাপা পড়ে গেল।

সরে যাবার চেষ্টা করল। বেধে গেল মুসার সাইকেলে। হ্যান্ডেলবারটা ছাড়িয়ে আনার জন্যে টানাটানি শুরু করল কিশোর।

'ছাড়ো, ছাড়ো!' চিৎকার করে উঠল মুসা। লাফ দিয়ে নেমে কিশোরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে এল রাস্তার পাশে। আছড়ে পড়ল সাইকেল দুটো।

'আরে!' চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ইচ্ছে করে চাপা দিতে চাইছে!'

ছয়

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তাকিয়ে আছে ভ্যানটার দিকে। গর্জন করে মোড়ের ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে ওটা। ফিরে তাকাল দুই সহকারীর দিকে। 'তোমাদের লেগেছে?'

'সামান্য,' মুসা বলল। 'এই ভ্যানটাকেই জঙ্গলের মধ্যে দেখেছিলাম। হলো কি লোকটার? বনের মধ্যে গুলি করল, রাস্তায় বেরিয়ে চাপা দিতে চাইল! মাতাল নাকি?' হাতের তালুর দিকে তাকাল সে। ঘষা লেগে ছড়ে গেছে।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় সেভারনদের বাড়ি থেকে আমাদের বেরোতে দেখেছে সে। কোন কারণে ভয় দেখাতে চাইছে আমাদের।'

সাইকেলটা তুলল সে। ছিঁড়ে বেঁকে যাওয়া একটা স্পোক সোজা করল।

'একই দিনে দুই দুইবার অল্পের জন্যে বাঁচলাম আজ,' শুকনো কণ্ঠে মুসা বলল। 'গোয়েন্দাগিরির কাজটা বড় বেশি বিপজ্জনক।'

'ছেড়ে দিতে চাও?'

'না না, ছাড়ার কথা বলছি না।'

'লোকটার চেহারা দেখেছ?' শার্ট থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেলল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। গাঢ় রঙের জ্যাকেটটা শুধু চোখে পড়েছে। সরেই তো সারতে পারছিলাম না, দেখব কখন?'

'আমিও পারিনি,' মুসা বলল। 'এক পলকের জন্যে দেখলাম, খেপাটা

স্টিয়ারিঙে হুমড়ি খেয়ে আছে।'

'তবে ভ্যানের পেছনের হলুদ লোগোটা দেখেছি। তোমরা দেখেছ?'

রবিন আর মুসা দুজনেই মাথা নাড়ল।

'আমারও তো তোমার অবস্থা,' রবিন বলল। 'সরে বাঁচব, না দেখব?' হাঁটু ডলল। জ্বালা করছে। 'ছড়ে গেছে মনে হয়। হাড্ডিতেও লাগল কিনা কে জানে। সকালে উঠে আর হাঁটতে পারব না কাল।'

'লোগোটা আমার চেনা,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'খামের কোণায় যে লোগো দেখেছি, অবিকল সেরকম। হলুদ রঙের দুটো অক্ষর। এস আর এইচ অক্ষর দুটো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটার ভেতর আরেকটা ঢুকিয়ে লিখে তৈরি করেছে।

'তবে ওই পেঁচানো অক্ষরের মালিক যারাই হোক,' শুকনো গলায় মুসা বলল, 'তারা ড্রাইভারের পদে একটা পাগলকে চাকরি দিয়েছে, যে দিনে-দুপুরে গাড়িচাপা দিয়ে মানুষ মারতে চায়।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে,' রবিন বলল।

'আমার তা মনে হয় না।'

'আমারও না,' কিশোর বলল। 'বনের মধ্যে গুলি করা, রাস্তায় গাড়িচাপা দেয়ার চেষ্টা, এবং একটা বিশেষ লোগো; সবই কাকতালীয় হতে পারে না। ওই লোগোটা কোন্ কোম্পানির, সেটা এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না। তবে উপায় একটা বেরিয়েই যাবে।'

*

পুরানো জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন রাশেদ পাশা, পুরানো বহু বাড়ি থেকে বহুবার জিনিসপত্র কিনে এনেছেন তিনি। সামনে পেয়ে তাঁকেই প্রথম জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর। হতাশ হতে হলো না। ম্যানিলা রোড চেনেন রাশেদ পাশা। দুদিন আগেও গিয়েছেন একটা বাড়িতে পুরানো মাল দেখে আসার জন্যে। আবারও যাবেন। যাই হোক, জায়গাটার আগের মালিক কারা ছিল, পরে কারা কিনেছেন, বলতে পারলেন। সেভারনরা যে কিনেছেন, জানেন তিনি। ভূতের গুজবটাও শুনেছেন। তবে লোগোটা কোন্ কোম্পানির বলতে পারলেন না। তা না পারলেও একটা মূল্যবান পরামর্শ দিলেন, 'পাবলিক লাইব্রেরিতে চলে গেলেই পারিস। কোম্পানিগুলোর ওপর একটা ডিরেক্টরি করেছে ওরা। ওতে পেয়ে যাবি। এক কোম্পানির লোগো কখনও আরেক কোম্পানি নকল করে না, দুটোর চেহারা অবিকল এক রকম হয় না। সহজেই পেয়ে যাবি।'

চাচাকে ধন্যবাদ দিয়ে তক্ষুণি সাইকেল নিয়ে রওনা হলো লাইব্রেরিতে।

লাইব্রেরির 'তথ্য বিভাগে' ঢুকে তাকের দিকে এগোতে যাবে, কে যেন তার নাম ধরে ডাকল, 'হাই কিশোর!'

ফিরে তাকিয়ে দেখে কেরি জনসন হাত নাড়ছে। তেতো হয়ে গেল

মনটা। শুরু করবে এখন খোঁচানো কথা। আসার আর সময় পেল না মেয়েটা!

না গেলে কথা বলার জন্যে উঠে আসবে কেরি, কোনভাবেই তার হাত থেকে মুক্তি নেই। নিজে গিয়ে বরং কিজন্যে ডাকছে শুনে আসা ভাল। এগিয়ে গেল কিশোর। হাসিটা ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, কেরি?'

'ভাল। তুমি এই অসময়ে?'

'পড়াশোনার কি আবার সময়-অসময় আছে নাকি?'

জবাব দিতে না পেরে জিজ্ঞেস করল কেরি, 'তোমার লেখাটার কদ্দূর? ফুটপাথ অ্যান্ড হাইওয়ে?'

'হয়নি এখনও। হয়ে যাবে।'

'ও ব্যাপারে পড়াশোনার জন্যেই এলে নাকি?'

'নাহ্,' বই ঘাঁটতে গেলে তাক দেখেই অনুমান করে ফেলবে কেরি, কি খুঁজতে এসেছে কিশোর। কৌতূহল বেড়ে গেলে উঠে চলেও আসতে পারে দেখার জন্যে। ঝামেলা এড়ানোর জন্যে সত্যি কথাটাই বলল সে, 'একটা সাদা ভ্যানে বিচিত্র একটা লোগো দেখলাম। এস আর এইচ পেঁচিয়ে আঁকা। ভ্যানটা আরেকটু হলেই চাপা দিচ্ছিল আমাকে। পালিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। কমপ্লেন করব আমি ওর নামে। ডিরেক্টরি দেখে কোম্পানির নামটা খুঁজে বের করতে এসেছি।'

'লোগোটা কেমন, এঁকে দেখাও তো।'

'চেনো নাকি তুমি?'

'দেখাওই না।'

কেরির সামনে নোটবুক আর পেন্সিল পড়ে আছে। এঁকে দেখাল কিশোর।

'ও, শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানি। চিনি তো। আমার আঙ্কেল চাকরি করে ওখানে।'

'কি বললে?'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোম্পানি যখন, যে কেউ চাকরি করতে পারে ওখানে, তাই না? আমার আঙ্কেল হলেই বা কি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত প্রায় কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কেরির দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কাকতালীয়ভাবে সে-ই একটা মস্ত উপকার করে দিল; অবশ্য না জেনে, কিশোররা যে তদন্ত করছে এটা জানলে হয়তো এত সহজে বলত না।

'তা তো বটেই,' অবশেষে জবাব দিল কিশোর। 'কোম্পানিটা কিসের? মাছ বেচাকেনার নাকি?'

হাসল কেরি। 'এ কথা মনে হলো কেন?'

'লোগোটা দেখে।'

'মাছের ধারেকাছেও না। জমি কেনাবেচার ব্যবসা করে ওরা। বাড়ি বানানোর কন্ট্রাক্ট নেয়।'

'জমি বেচাকেনা!'

'তোমার হলো কি আজ? কথায় কথায় অবাক হচ্ছ। কেন, জমি

বেচাকেনা কি দোষের নাকি?'

'না না, তা নয়···এমনি···'

বেশি কথা বলতে গেলে কি সন্দেহ করে বসে কেরি, এজন্যে তাড়াতাড়ি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।

*

'তারমানে···সত্যি সত্যি বলে দিল!' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

বাড়ি ফিরেই ওকে ফোন করেছে কিশোর। 'হ্যাঁ। ভুল করে কি একখান উপকার করে ফেলেছে আমাদের, জানলে এখন নিজের হাত নিজেই কামড়ে খেয়ে ফেলবে।'

'মেজাজ-মর্জি বোধহয় খুব ভাল আছে আজ ওর। যাকগে, কি করবে এখন?'

'যাব ওদের অফিসে। জমি বেচাকেনা করে যখন, সেভারনদের জমিটা নেয়ার চেষ্টা করাটা অস্বাভাবিক নয়। হতে পারে, জায়গাটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে ওরা, বেচতে রাজি হচ্ছেন না মিস্টার সেভারন, সেটা নিয়েই বিরোধ। জমিটা কোম্পানির নেহাত দরকার, তাই ভয় দেখিয়ে বা অন্য যে কোনভাবেই হোক, তাঁদেরকে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছে ওরা।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই কারণ। বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি?'

'কেন?'

'জমিটা নিয়ে কোন বিরোধ থাকলে, কিংবা কোন অঘটন ঘটলে স্থানীয় পত্রিকায় ছোটখাট নিউজ ছাপা হওয়ার কথা। পুরানো পত্রপত্রিকা ঘাঁটলে···'

'আজ ঘুম ভেঙে পুণ্যবান কারও মুখ দেখেছিলাম! চতুর্দিক থেকে চমৎকার সব সাহায্য আসছে। এক্ষুণি চলে এসো ইয়ার্ডে। তুমি এলেই আঙ্কেলকে ফোন করব। আঙ্কেল অফিসে থাকলে এখনই যাব চলে এসো। দেরি কোরো না।'

*

পত্রিকার বিশাল বিল্ডিংটাতে ঢুকে সরাসরি মিস্টার মিলফোর্ডের অফিসে চলে এল দুজনে। খুব ব্যস্ত তিনি। ছেলেদের দেখে সরাসরি কাজের কথায় এলেন, 'বছরখানেক আগেই সম্ভবত ওদের নিয়ে একটা নিউজ ছাপা হয়েছে। বারো-তেরো মাস আগের পত্রিকাগুলো ঘাঁটো, পেয়ে যাবে।'

এ অফিসে বহুবার এসেছে কিশোর আর রবিন। পুরানো পত্রিকা কোথায় রাখা হয় জানে। চলে এল সেঘরে। তাক থেকে পত্রিকার বান্ডিল নামিয়ে টেবিলে ফেলল। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে।

নিউজটা খুঁজে বের করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি লাগল না। আধ কলামের একটা লেখা বেরিয়েছিল শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির ওপর। কোম্পানির অফিসের একটা ছবি ছাপা হয়েছে। সাইনবোর্ডে বড় করে আঁকা লোগোটাও স্পষ্ট। লম্বা এক মহিলা দাঁড়ানো অফিসের সামনে। মূলত তাকে উদ্দেশ্য করেই ছবিটা তোলা হয়েছে। ছবির নিচে ক্যাপশন : শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির বর্তমান মালকিন মিসেস অগাস্ট শাজিন।

প্রতিবেদন পড়ে জানা গেল কোম্পানির মূল মালিক ছিলেন মিস্টার হ্যারিসন। শাজিন তাঁর স্ত্রী। বিয়ের বছর দুই পরেই ক্যান্সারে মারা গেলেন মিস্টার হ্যারিসন। শেষ দিকে বাজার খারাপ ছিল বলে প্রচুর ঋণ হয়ে গিয়েছিল কোম্পানির। ব্যাংক প্রস্তাব দিল নিলামে চড়ানোর। কিন্তু কোম্পানি বেচল না শাজিন। শক্ত হাতে হাল ধরল। ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দিল সুদে-আসলে। কোম্পানিটা আবার দাঁড়িয়ে গেলেও অবস্থা এখনও ভাল নয়।

শাজিনের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকা লিখেছে, মিসেস শাজিন হ্যারিসন এই শহরের পতিত জমিগুলোর একটা বিহিত করতে চান। অহেতুক পড়ে থাকার চেয়ে ওগুলোতে কারখানা বা বহুতল আবাসিক বাড়ি কিংবা মার্কেট গড়ে তুলতে পারলে শহরেরও উন্নতি হবে, লোকের কর্মসংস্থানও হবে। তিনি সেই চেষ্টাই করছেন। এ ভাবে নিজেরও উন্নতি করতে চান, শহরবাসীরও।

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। মগজের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ভাবনা। কোন সন্দেহ নেই আর তার, অতিরিক্ত লাভ দেখতে পাচ্ছে বলেই সেভারনদের বাড়িটা কিনে নিতে চায় শাজিন। বিরাট জায়গা সেভারনদের, কিন্তু জংলা বলে বাজার দর তেমন হবে না। বিক্রি করতে তাঁদের কোনমতে রাজি করাতে পারলে অল্প পয়সায়ই কিনে নিতে পারবে। আর শাজিনের যা পরিকল্পনা, সেটা বাস্তবায়িত করতে পারলে কোটিপতি হতে দেরি হবে না।

শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির আর কোন নিউজ আছে কিনা দেখতে শুরু করল আবার দুজনে। পাওয়া গেল আরেকটা ছোট খবর। কোম্পানিরই জনৈক কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিরীহ মানুষের জমি দখলের অভিযোগ এনে।

'ইনটারেস্টিং!' কিশোর বলল। গভীর মনোযোগে কয়েকবার করে খবরটা পড়ল সে। মামলাটা আদালতে বিচারের জন্যে ওঠেনি একবারও। ধামাচাপা পড়ে গেল কিছুদিন পর সেই কর্মচারীকে অফিসের টাকা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নামটা গোপন করে গেছে পত্রিকা, কারণ এখনও বিচার শেষ হয়নি লোকটার, চোর প্রমাণ করতে পারেনি আদালত।

'তারমানে রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানিতে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'যত শীঘ্র সম্ভব এখন গিয়ে হানা দিতে হবে ওদের অফিসে। কিন্তু তার আগে একবার সেভারনদের বাড়িতে যাওয়া দরকার।'

'কেন?'

জবাব দিল না কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

সাত

বাড়ির কাছাকাছি আসতে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল এক লোকের সঙ্গে, কুকুর

নিয়ে হাঁটছে। সেভারনদের বাড়ির গেটে কিশোরদের থামতে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'সেভারনরা তো নেই।'

'কোথায় গেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'ডে সেন্টারে। সকালে।'

'ও।'

'এতটা পথ অযথাই এলাম,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল রবিন। লোকটার চলে যাওয়ার অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'ভেতরে আছে নাকি দেখা দরকার। থেকেও তো দেখা দেন না অনেক সময়।'

'কিন্তু ডে সেন্টারে চলে গেছেন বলল। না দেখলে কি আর বলেছে।'

'ফিরেও তো আসতে পারেন। যেতে দেখেছে, ফিরতে দেখেনি।'

'ঢুকে দেখতে বলছ?'

'অসুবিধে কি?'

এতটা এসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরেরও নেই। কটেজের পেছন দিকটায় এসে একটা জানালা খোলা দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ কি!'

'কি?'

'জানালা খোলা

'তাতে কি?'

'দরজা-জানালা বন্ধ রাখার ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধান ওঁরা। দেখা দরকার।'

'কি দেখতে এসেছ জানি না। যাই হোক, তুমি দেখতে থাকো, আমি ওই বনের দিকটায় একটু ঘুরে আসি।'

চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। সামার-হাউসের দরজা খোলা, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। কয়লা রাখার বাংকারটার ওপরে উঠে ফ্যানলাইট উইন্ডোর ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল।

মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে। ওটা চলে যাওয়ার পর যখন শব্দ সরে গেল একটা ঠনঠন শব্দ কানে এল। হাতুড়ি দিয়ে ধাতব কিছু পিটাচ্ছে কেউ। তারপর কটেজের ভেতরে আসবাব টানাটানি করার শব্দ। ভুরু কুঁচকে তাকাল সে সেভারনরা যদি ডে সেন্টারেই চলে গিয়ে থাকেন, কে টানাটানি করছে?

'মিস্টার সেভারন, মিস্টার সেভারন' বলে ডাক দিল সে।

জবাব নেই

ভেতরে ঢুকে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামার-হাউসে ঢুকে পড়ল সে। পুরানো একটা গুটিয়ে রাখা কার্পেটের পাশে তারের তৈরি পুরানো দুটো কোটের হ্যাঙ্গার। একটা হ্যাঙ্গার নামিয়ে এনে তারের মাথা যেখানে জোড়া দেয়া, সেখানটা খুলে ফেলল। তারটা সোজা করল টেনে টেনে। মাথার কাছটা সামান্য বাঁকিয়ে নিল বড়শির মত করে। ফিরে এসে আবার চড়ল কোল বাংকারে। ছোট ফ্যানলাইট জানালার মধ্যে তারের বাঁকা মাথাটা ঢুকিয়ে

ভেতরের হুড়কো খুলে ফেলল। মূল পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলতে আর কোন অসুবিধে হলো না। এবার ঢোকা যাবে ওপথে।

ভাবনা চলেছে ওর মাথায়। ভেতরে যদি কেউ থেকেই থাকে, তাহলে কোনদিক দিয়ে ঢুকল সে? যদি এ জানালাটা দিয়ে ঢুকত, তাহলে আর হুড়কো লাগাত না, খোলা রাখত, যাতে তাড়াহুড়োর সময় দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে।

দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। জানালা গলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। আস্তে করে আবার লাগিয়ে দিল পাল্লা।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। ঢোকার আগে রবিনকে ডেকে এনে পাহারা দেয়ার জন্যে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে ভাল হত। এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই।

হঠাৎ একটা জোরাল শব্দে চমকে গেল সে। ভূতে আসর করা ঘরটা থেকে আসছে।

আস্তে করে দরজা খুলে সরু হলওয়ে ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কিশোর। ভূতের ঘরের ভারী ওক কাঠের দরজাটা বন্ধ। তাতে কান চেপে ধরল। ভেতর থেকে আসছে ঠোকাঠুকির শব্দ। বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলছে কেউ।

খুব সাবধানে পিতলের নবটা চেপে ধরে ঘোরানো শুরু করল কিশোর। পুরোটা ঘুরে যেতে ঠেলা দিল। খুলে গেল দরজা। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ধাক্কা মারল যেন গালে।

'কি...' বলতে গেল সে।

কালো একটা মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে আগুনের ধারে পাতা টেবিলে রাখা টিনের ট্রাংকটার ওপর। ঝট করে সোজা হয়ে ফিরে তাকাল। চমকে গেল কিশোরকে দেখে। পরনে কালো জিনস, গায়ে কালো কমব্যাট জ্যাকেট। মাথার ব্যাক্লাক্লাভা ক্যাপ টেনে নামিয়ে মুখ ঢেকেছে। চোখের জায়গার দুটো ফুটো দিয়ে কালো একজোড়া চকচকে মণি দেখা যাচ্ছে। লোকটা বেশ লম্বা। কেমন ঝুলে পড়া মেয়েলী কাঁধ।

তালা ভেঙে খোলা হয়েছে ট্রাংকটা। কাছেই পড়ে আছে একটা হাতুড়ি। বাইরে থেকে এই তালা ভাঙার শব্দই কানে এসেছিল।

তাড়াতাড়ি ট্রাংকের ভেতর থেকে একমুঠো দলিল তুলে নিল লোকটা। ওগুলো বেঁধে রাখা লাল ফিতেটা ঢিল হয়ে আছে।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি করছেন?'

কাগজগুলো দ্রুত পকেটে ভরার চেষ্টা করল লোকটা। ঢোকাতে না পেরে হাত থেকে ছেড়ে দিল। তুলে নিল হাতুড়িটা।

'সরো এখান থেকে! যাও!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিকৃত কণ্ঠে গর্জে উঠল সে। হাতুড়িটা ঝাঁকাতে লাগল বাড়ি মারার ভঙ্গিতে।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। কি করা যায়? দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে যদি এখন দরজার তালাটা লাগিয়ে দিতে পারে, ঘরে আটকা পড়বে লোকটা। তারপর পুলিশকে ফোন করলে...। বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ঘরে

আটকে থাকবে না লোকটা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

ভাবার সময় কম। কাছে চলে এসেছে লোকটা। লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

কিছুদূর উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে লোকটা। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন সম্মোহিত করার চেষ্টা করছে ওকে।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল এই সময়, 'কিশোর, কোথায় তুমি?'

রবিন!

বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠল কিশোরের। চিৎকার করে বলল, 'রবিন, সাবধান!'

গজগজ করে কি যেন বলল লোকটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজল। সোজা গিয়ে সামনের দরজার শেকল সরিয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

রবিনের চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাই, অ্যাই!'

দৌড়ে নেমে এল কিশোর। সামনের দরজার সামনে এসে দেখল, রাস্তাটার দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।

'কিশোর, লোকটা কে? আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড়ে চলে গেল।'

'চোর! চোর!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেটের দিকে ছুটল। পলকের জন্যে দেখল মোড়ের ওপাশে চলে যাচ্ছে লোকটা।

'চোর!' পেছনে প্রায় কানের কাছে শোনা গেল রবিনের চিৎকার। 'ঢুকল কি করে?'

'জানি না,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর।

'কি নিতে এসেছিল? দামী গহনা-টহনা আছে নাকি?'

'দেখার সময় পাইনি। কতগুলো কাগজ ঘাঁটতে দেখলাম।'

'তাহলে দেখে ফেলো না।'

'এসো।'

ভূতের ঘরটায় ফিরে এল ওরা। ট্রাংকের জিনিসগুলো ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

'এটা কি?' লাল ফিতেয় বাঁধা কাগজের বান্ডিলটা মেঝে থেকে তুলে নিতে নিতে বলল রবিন।

'দেখি।'

ফিতেটা খুলে কাগজগুলো দেখে গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর. 'হুঁ, বাড়ির পুরানো দলিল।'

'এগুলো নিতে চেয়েছিল কেন?'

'জানি না। হতে পারে, সেভারনদের মালিকানার প্রমাণ গায়েব করে দিতে চেয়েছে।'

'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। নিলে লাভটা কি? তুমি অফিস থেকে যে কোন সময় দলিলের নকল জোগাড় করে নিতে পারবেন মিস্টার সেভারন।' জানালার বাইরে চোখ পড়তে বলে উঠল রবিন, 'ওই যে, সেভারনরা আসছেন।'

কিশোরও এসে দাঁড়াল রবিনের পাশে। স্ত্রীকে ধরে ধরে আনছেন মিস্টার সেভারন।

ঘরের মধ্যে দুই গোয়েন্দাকে দেখে চমকে গেলেন তাঁরা।

'কিশোর!' কিছুই বুঝতে না পেরে চোখ মিটমিট করতে লাগলেন মিসেস সেভারন। 'কি করছ তোমরা এখানে?' খুব ক্লান্ত লাগছে তাঁকে। কাতরকণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলেন।

'কি হয়েছে মিসেস সেভারনের?' জানতে চাইল কিশোর।

'ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'মোড়ের ওপাশে আমাদের নামিয়ে দিয়েছে মিনিবাসের ড্রাইভার, ডে সেন্টার থেকে এলাম আমরা। হেঁটে এগোচ্ছি, এই সময় মোড়ের ওপাশ থেকে দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে কোরিনকে মাটিতে ফেলে দিল একটা লোক, একেবারে উন্মাদ, পাগল ছাড়া কিছু তো মনে হয় না!'

'খামোকা ভয় পাচ্ছ তুমি, জন,' মিসেস বললেন। 'আমার কিছু হয়নি! লাগেনি কোথাও। পড়ে গিয়ে চমকে গেছি, এ ছাড়া আর কিচ্ছু হয়নি।'

'চিনতেও পারলাম না লোকটাকে...'

'আমি জানি, কে,' কিশোর বলল। 'যে লোক এ ঘরে ঢুকেছিল, সে-ই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে মিসেস সেভারনকে।'

'এ ঘরে ঢুকেছিল!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিসেস সেভারনের। চিৎকার দিয়ে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিলেন। 'কিন্তু তোমরাই বা ঢুকলে কি করে?'

কিভাবে ঢুকেছে জানাল কিশোর। শেষে বলল, 'আপনাদের না বলে ঢোকার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে শব্দ শুনে সন্দেহ হলো, ভাবলাম চোরটোর হবে, তাই...'

বাধা দিয়ে মিসেস বললেন, 'জন, আমি ভেবেছি জানালাটা তুমি লাগিয়ে গেছিলে!'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার সেভারন, 'মনে তো ছিল লাগিয়েছি...বাসটা এসে যেভাবে হর্ন দিতে শুরু করল, মাথার ঠিক থাকে নাকি কারও!'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল, 'চোরটা ঢুকল কোন্ পথে? জানালা দিয়ে ঢোকেনি। বেরিয়ে গেল সামনের দরজা খুলে।' একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। 'তবে কিছু নিতে পারেনি।'

'আর থাকছি না আমি এখানে, অনেক হয়েছে!' আচমকা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস সেভারন। 'তোমার বাড়ির মায়া ছাড়ো!'

'একটা চোরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাব?' মিস্টার সেভারন নরম হলেন না।

'তাহলে কি পড়ে পড়ে মরব?'

'কে মারছে তোমাকে? অতি সাধারণ চোর। দুটো ছেলেকে দেখেই ভয়ে পালাল। ও কি করবে?'

'আমি একবার ভাবলাম,' কিশোর বলল, 'ওকে আটকে ফেলে পুলিশকে ফোন করব...'

'করোনি তো? ভাল করেছ। পুলিশ-টুলিশ চাই না এখানে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই।'

ধরে ধরে একটা চেয়ারে মিসেস সেভারনকে বসিয়ে দিল কিশোর আর রবিন।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'এক কাপ চা বানিয়ে এনে দাও না মিসেস সেভারনকে।'

'যাচ্ছি,' বলেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল রবিন।

তাকের ওপর কাপ-পিরিচ নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'দেখুন, দয়া করে এবার সব বলুন এখানে কি ঘটছে। কিছু লুকাবেন না, প্লীজ। আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাইছি। আমার বিশ্বাস, কেউ একজন ভালমত পেছনে লেগেছে আপনাদের। বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।'

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস সেভারন। তারপর মাথা তুলে তাকালেন স্বামীর দিকে। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'বলো, জন।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার সেভারন। 'যত নষ্টের মূল একজন মহিলা।'

'অগাস্ট শাজিন?'

ভুরু কুঁচকে গেল মিস্টার সেভারনের, 'তুমি জানলে কি করে?'

'তদন্ত করে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার সেভারন। 'তদন্তটা কিভাবে করেছ, জানতে চাই না। তবে একটা কথা স্বীকার করছি, বয়েস কম হলে কি হবে, খুব ভাল গোয়েন্দা তোমরা। নাম যখন জানো, এটাও নিশ্চয় জানো, জমি কেনাবেচার ব্যবসা আছে তার।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'জানি। এটাও অনুমান করেছি, আপনাদের বাড়ি থেকে আপনাদের তাড়াতে চাইছে সে-ই। জোর করে কিনে নিতে চাইছে। যেহেতু আপনারা রাজি হচ্ছেন না, ভয় দেখিয়ে বিদেয় করতে চাইছে।'

'হ্যাঁ। বনের ওপাশে যে স্পোর্টস সেন্টার আর শপিং সেন্টার করেছে, ওগুলোর মালিক শাজিন কোম্পানি। আরও নানা রকম সেন্টার করতে চায় সে, এর জন্যে বড় জায়গা দরকার, আর সেকারণেই আমাদের জায়গাটা নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। বাজারদরের চেয়ে বেশি তো দিতেই চায়, অন্য জায়গায় একটা বাড়িও দেবে বলেছে। কিন্তু সাফ বলে দিয়েছি, বেচব না। বুড়ো বয়েসে একটু শান্তি দরকার, শান্তিতে বাস করতে চাই; নড়াচড়া এখন

একদম সহ্য হবে না।'

'কিন্তু জন, জ্যাকি...'

'ওর কথা থাক।'

ছেলের কথা উঠতে কাঁদতে শুরু করলেন মিসেস সেভারন।

মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মিস্টার সেভারন।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল কিশোর। উস্‌খুস করে বলল, 'যাই, দেখি, রবিনের চা কদ্দূর হলো।'

রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার পথে হলঘরে চোখ পড়ল তার। টেবিলে পড়ে আছে এখনও চিঠিগুলো। কানে আসছে স্ত্রীর প্রতি মিস্টার সেভারনের সান্ত্বনাবাক্য।

এটাই সুযোগ! দ্রুত টেবিলটার কাছে চলে এল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেস পোস্ট অফিসের ছাপ মারা চিঠিটা তুলে নিল। ঠিকানার হাতের লেখাটা দেখতে লাগল ভালমত। কোন সন্দেহ নেই। বইটাতে জ্যাকি সেভারনের লেখার সঙ্গে ঠিকানার হাতের লেখার হুবহু মিল রয়েছে।

কাঁপা হাতে চিঠিটা বের করল কিশোর। ওপরের দিকটায় শুধু তারিখ লেখা, কোন্‌খান থেকে পাঠিয়েছে লেখেনি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল সে। কিন্তু কাগজ উল্টে অন্যপাশটা দেখতেই চোখ স্থির হয়ে গেল তার। রবারের স্ট্যাম্প দিয়ে সীল মারা রয়েছে : পাস্‌ড্। প্যাসিফিক কাউন্টি প্রিজন, প্যাসিফিক কাউন্টি, লস অ্যাঞ্জেলেস।

প্রিজন! মানে জেলখানা! নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। সেভারনদের ছেলে জেলখানায় বন্দি। সেজন্যেই তার সম্পর্কে কোন কথা বলতে চান না ওঁরা, এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা।

জেলখানায় বন্দি, তারমানে অপরাধী। কিন্তু সেভারনদের মত ভালমানুষদের ছেলে অপরাধী এটা মেনে নিতে কষ্ট হলো তার। মনে পড়ল পত্রিকার নিউজটার কথা : শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির এক কর্মচারী কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল, পরে তাকেই চোর সাব্যস্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

চিঠিটা আবার খামে ভরে টেবিলে আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর।

*

'বাজি রেখে বলতে পারি আমি, জ্যাকি অফিস থেকে কিছু চুরি করেনি। সব সাজানো ঘটনা। তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে।'

বাড়ি ফেরার পথে সাইকেল চালাতে চালাতে বলল কিশোর।

'কে ফাঁদে ফেলল?' জানতে চাইল রবিন।

'এখনও বুঝতে পারছ না? চলো, বাড়ি চলো। সব বলব।'

আট

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ জ্যাকি নির্দোষ?' বেড়ায় হেলান দিল টুলে বসা মুসা। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে জরুরী আলোচনায় বসেছে ওরা।

'হ্যাঁ,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় জ্যাকি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল শাজিনের জন্যে, কায়দা করে তাই জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এর সাথে সেভারনদের মনোবলও ভেঙে দিতে চেয়েছে।'

'অফিসে চাকরি করত বলে নাহয় ছেলেটাকে জেলে ঢোকানোর সুযোগ পেয়েছে,' রবিন বলল, 'কিন্তু তার বাবা-মাকে কি করে কটেজ থেকে সরাবে?'

'ওই যে, ভয় দেখাচ্ছে। সারাক্ষণ এ রকম স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে থাকলে, এক সময় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন সেভারন। সেটা রুখতে হবে আমাদের। ওই চোরটা কে, কোনখান থেকে এসেছে জানতে পারলে ভাল হত।'

'সেই লোকটা না তো,' মুসা বলল, 'যে আমার ওপর গুলি চালিয়েছিল? আমাদের গাড়ি চাপা দিতে চেয়েছিল?'

'আমার তাই ধারণা,' কিশোর বলল।

'লোগোওয়ালা ভ্যানটা যেহেতু চালায়, তারমানে শাজিনের কোম্পানিতে চাকরি করে সে?'

'করতে পারে। কিংবা শাজিন ওকে বহালই করেছে সেভারনদের ভয় দেখানোর জন্যে। ভয় পেয়ে সরে গেলে তখন বাধ্য হয়ে কটেজ আর সমস্ত জায়গা শাজিনের কাছে বিক্রি করে দেবেন মিস্টার সেভারন, মহিলা নিশ্চয় সেটাই ভাবছে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মুসা বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়, জ্যাকিকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি আমরা। ও এখন কোথায় আছে জানি। দিতে অসুবিধে কি?'

'কোন অসুবিধে নেই,' ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করল কিশোর। 'বরং ভাল হবে। বাবা-মাকে তখন চিঠি লিখে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করবে সে। তাতে মনে জোর পাবেন সেভারনরা।'

'কি লিখবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'লিখব, আমরা তার বাবা-মা'র তিনজন বন্ধু। লিখব, তাঁদের জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন, কারণ অগাস্ট শাজিন...' থেমে গেল কিশোর।

'থামলে কেন?' ভুরু নাচাল মুসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'লিখব, তার বাবা-মাকে ভয় দেখানোর জন্যে লোক নিয়োগ করেছে শাজিন। ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে।'

'তা লেখা যায়,' মাথা দোলাল রবিন।

'এখানে যা যা ঘটছে, সবই লিখব। ওর বাবা-মা যে পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন না, এ কথাও জানাব।'

'আচ্ছা,' অন্য প্রসঙ্গে গেল মুসা, 'শাজিন আর তার শয়তান গুণ্ডাটা কি বুঝতে পারছে আমরা তদন্ত করছি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। ও হয়তো ভেবেছে, আমরা সেভারনদের বন্ধু, কিংবা আত্মীয়; তাই ওঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করার জন্যে আমাদেরও ভয় দেখিয়েছে। ভেবেছে বন্দুক তুললে আর গাড়ি চাপা দেয়ার ভয় দেখালেই সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকে পড়ব আমরা।'

'ব্যাটাকে হাতে পেলেই হয় একবার, ওর বন্দুক দেখানো আমি বের করব!'

জ্যাকিকে চিঠি একটা লিখেই ফেলল কিশোর।

রবিন বলল, 'আমার কাছে দাও। বাড়ি যাবার পথে পোস্ট করে দিয়ে যাব। আশা করি কালই চিঠিটা পেয়ে যাবে সে।'

*

পরদিন সকালে মিসেস সেভারনের ফোন পেল কিশোর।

'কিশোর,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তোমরা কি একবার আসতে পারবে?'

'পারব। কেন, মিসেস সেভারন?'

'কাল রাতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তোমরা এসো। এলে তদন্ত করতে পারবে।'

*

তিন গোয়েন্দা কটেজে পৌঁছে দেখল রাতের ঘটনায় মিসেস সেভারন গেছেন ভড়কে, মিস্টার সেভারন গেছেন রেগে।

'দেখো, কি করেছে,' মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা ফুলের বেডগুলো দেখালেন মিস্টার সেভারন। 'পাতাবাহারের বেড়াটা পুরো ধসিয়ে দিয়েছে।' রাগে, ক্ষোভে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল তাঁর। গলাটা খসখসে শোনাল। 'আরও কি সর্বনাশ করেছে জানো? বাগানের পুকুরটার পানি নষ্ট করে দিয়েছে পোকা মারার বিষ ফেলে। গল্ডফিশ? সমস্ত গোল্ডফিশগুলো মেরে ফেলেছে।'

নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল কিশোর। 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ফুল গাছের পোকা মারার জন্যে আমিও এ বিষ পানির সঙ্গে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করেছি বহুবার।'

নিচু হয়ে নষ্ট করে ফেলা ফুলের বেডগুলো পরীক্ষা করতে লাগল সে। জুতোর ছাপ চোখে পড়ল। রাবার সোলের জুতো। গোড়ালিতে গোল গোল চক্র, ভালমতই দাগ বসে গেছে। 'আপনাদের ভয় দেখিয়ে ভড়কে দেয়ার জন্যেই এ কাজ করেছে শয়তানটা।' মুখ তুলে মিস্টার সেভারনের দিকে তাকাল সে, 'যাতে কটেজ বেচে দিয়ে চলে যান।'

'জানি,' তিক্তকণ্ঠে বললেন মিস্টার সেভারন। 'চলো ঘরে চলো। একটা

জিনিস দেখাব তোমাকে।'

*

ঘরে পা দিয়ে মিসেস সেভারনকে রবিন আর মুসার কাছে বলতে শুনল কিশোর, '...কাল রাতে আবার শুনেছি সেই অদ্ভুত শব্দ।'

'ক'টার সময়?' জানতে চাইল রবিন।

'রাত বারোটার দিকে...বারোটায় শুরু হলো, কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল।'

'বাতাসের শব্দ নয়তো?' মুসা জিজ্ঞেস করল, যদিও তার সন্দেহ নেই ভূতে করেছে ওসব শয়তানি। 'সত্যি, রাতের বেলা শব্দগুলো ভয়ঙ্কর লাগে শুনতে। ফায়ার পর্যন্ত মাঝে মাঝে ঘাবড়ে গিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে।'

'আমার মনে হয় না বাতাসের শব্দ,' মিসেস সেভারন বললেন। 'শুধু কি তাই...' কাঁপা হাতে কার্ডিগানের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিলেন তিনি, 'দেখো!'

মুসা বা রবিন ধরার আগেই এগিয়ে এসে চিঠিটা নিয়ে নিল কিশোর। খামের গায়ে নোংরা আঙুলের ছাপ। ভেতরে এক টুকরো কাগজ। তাতে টাইপ করে একটা লাইন লেখা। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

কাল রাতে ঘুমাতে পেরেছ?

নীরবে কাগজটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর, যাতে রবিন আর মুসা দুজনেই দেখতে পারে।

'খাইছে!' দেখেই বলে উঠল মুসা। মিসেস সেভারনের দিকে তাকাল। 'কখন পেলেন?'

'সকালে। ডাকবাক্সে,' গলা কাঁপছে মিসেস সেভারনের। 'কি করব আমরা, বলো তো? এই অত্যাচার আর তো সহ্য করতে পারছি না!'

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে আস্তে করে তাঁর বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'আজ রাতে এসে পাহারা দেব আমরা। কোনমতে যদি ধরতে পারি বাছাধনকে, জেলের ঘানি না টানিয়ে ছাড়ব না। কত্তবড় সেয়ানা লোক, দেখে নেব।'

'না না, এ কাজ করতে দেব না আমি তোমাদের! ওরা লোক ভাল না। বিপদ হতে পারে। খারাপ কিছু ঘটে গেলে কি জবাব দেব তোমাদের বাবা-মা'র কাছে?'

'এ নিয়ে এক বিন্দু চিন্তাও আপনি করবেন না,' অভয় দিল রবিন। 'বিপদে পড়লে কি করে উদ্ধার পেতে হয় জানা আছে আমাদের। শুনলে আমাদের আব্বা-আম্মা কিছু তো বলবেই না, বরং তারাও সাহায্য করতে চাইবে আপনাদের।'

'হ্যাঁ,' রবিনের কথায় সুর মিলিয়ে বলল মুসা, 'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না আপনারা।'

হাসলেন মিসেস সেভারন। কিন্তু দ্বিধা যাচ্ছে না তাঁর। 'তবু, সাবধান থাকা

উচিত তোমাদের।'

'তা তো থাকবই,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না।'

বিদায় নেয়ার আগে কিশোর জানতে চাইল, হুমকি দিয়ে লেখা নোটটা তার কাছে থাকলে কোন অসুবিধে আছে কিনা।

'কি করবে এটা দিয়ে?' জানতে চাইলেন মিস্টার সেভারন।

'এখনও জানি না। তবে তদন্ত করতে গেলে কাজে লাগতে পারে।'

'বেশ, রাখো। কাজে লাগলে তো ভালই।'

*

'টাইপিঙের গোলমালটা চোখে পড়েছে তোমাদের?' বাড়ি ফেরার সময় সাইকেল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'ও অক্ষরটা সবখানেই বড় হাতের, বাক্যের শুরুতেও, বাক্যের মাঝখানেও। মেশিনের ওই কী'টা নষ্ট। টিপতে গেলে বার বার ক্যাপিটল লেটারটাই ওঠে।'

'সেজন্যেই চিঠিটা নিয়ে এলাম। এই সূত্র ধরেই লেখকের আস্তানা আর তার নামটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারব। তারপরে রয়েছে খামের ওপর আঙুলের ছাপ। প্রমাণও করা যাবে কে লিখেছে চিঠিটা, কোনমতেই পার পাবে না। বাগান যে তছনছ করেছে, তাকেও ধরা কঠিন হবে না। চিঠির লেখক আর বাগান তছনছকারী একই লোক হলে তো আরও ভাল।'

'সেভারনদের ওখানে ক'টার সময় যেতে হবে?' জানতে চাইল মুসা।

'দেখি। এগারোটার আগে গিয়ে বোধহয় লাভ হবে না।'

*

উষ্ণ রাত। গা আঠা করা গরম। বাতাসে ঝড়ের সঙ্কেত। ওঅর্কশপের বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখা সাইকেল তিনটা যখন সরিয়ে এনে চেপে বসল তিন গোয়েন্দা, এক টুকরো ঘন কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে চাঁদ।

'ঝড় আসবে,' আকাশের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রবিন।

'নৈশ অভিযানের ষোলোকলা পূর্ণ হবে তাহলে,' শুকনো গলায় বলল মুসা।

'কি আর হবে,' শান্ত রয়েছে কিশোর, 'উত্তেজনাটা বাড়বে আরকি।'

সাইকেলের আলোটা জ্বেলে দিল সে। সামনের জঞ্জালের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আলো। প্যাডালে চাপ দিয়ে বলল, 'চলো, যাই।'

*

সেভারনদের বাড়িতে বনের কিনারে একটা ওক গাছের নিচে বসে আছে তিনজনে। মাথার ওপর বাতাসে মড়মড়, সরসর, কটকট করছে গাছের ডালপাতা। কালো মেঘের আড়াল থেকে মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে আবার ঢুকে গেল চাঁদটা। দূর থেকে ভেসে এল বজ্রের চাপা গুমগুম শব্দ। পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে যেন।

'ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার,' পকেট থেকে চকলেট বের

করে মোড়ক খুলতে শুরু করল মুসা। 'শুধু চোর-ডাকাত হলে এক কথা ছিল, মানুষকে আমি কেয়ার করি না, কিন্তু...'

একটা পেঁচা ডাকল ওকের ডালে। কাঁপা, কর্কশ, ভুতুড়ে ডাক ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সেই সঙ্গে বাতাসের ক্রুদ্ধ ফিসফিসানি মিলে এক ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করল। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। সরে এসে গা ঘেঁসে বসল দুই সঙ্গীর মাঝখানে।

অন্ধকারে মুচকি হাসল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'এমন রাতেই ভ্যাম্পায়ারেরা বেরোয়। সেই সিনেমাটাতে দেখোনি, দুটো টিনএজার ছেলেমেয়ে কিভাবে রক্ত খেতে বেরিয়েছিল রাত দুপুরে...'

'আহ্, কি সব অলক্ষুণে কথা শুরু করলে...'

'চুপ!' চাপা গলায় সাবধান করল কিশোর। 'ওই দেখো!'

'কি-কি...' ভীষণ চমকে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল মুসা।

'আরে, দেখছ না? ওই যে, ওদিকে।'

রবিন আর মুসাও দেখল, পা টিপে টিপে সেভারনদের কটেজের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা ছায়ামূর্তি। হাতে ঝুলিয়ে কোন ভারী জিনিস বয়ে নিচ্ছে।

'এল কোত্থেকে ও?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। 'মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো নাকি?'

'ভ্যা-ভ্যা-ভ্যাম্পায়াররা যে কোনওখান থেকে...'

'আমি শিওর, রাস্তায় কোনখানে গাড়িটা রেখে এসেছে ও,' মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'এবং কি গাড়ি, তা-ও বলে দিতে পারি।'

হঠাৎ দশদিক আলোকিত করে দিল বিদ্যুতের তীব্র নীল শিখা। ক্ষণিকের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল লোকটাকে। মাথায় ব্যালাক্লাভা ক্যাপ, গায়ে গাঢ় রঙের পোশাক।

'সেই লোকটাই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর।

'খাইছে!' আপনাআপনি মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

একদৌড়ে ঘাসে ঢাকা সবুজ জমি পেরিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল লোকটা।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই সঙ্গে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। মুখ তুলে তাকাল তিনজনেই। ওকের বড় একটা ডালে আঘাত হেনেছে বজ্র। স্ফুলিঙ্গ আর আগুনের কণা লাফ দিয়ে উঠে গেল কালচে ধোঁয়াটে আকাশে। আতঙ্কিত চিৎকার করে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি।

ভয় পেয়েছে গোয়েন্দারাও। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দেখল ভেঙে পড়ছে ডালটা।

সবার আগে সামলে নিল মুসা। এক চিৎকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে ছুটে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে, আরও ঘন গাছপালার আড়ালে। দেখাদেখি অন্য দুজনও তা-ই করল। কানফাটা শব্দ করে ভেঙে পড়ল ডালটা, একটু আগে ওরা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। বড় বাঁচা বেঁচেছে।

ঘাসের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে মুসা। কিশোর আর রবিন বসলে জিজ্ঞেস করল, 'লাগেটাগেনি তো?'

'না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

রবিনও জানাল লাগেনি।

আবার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল তিনজনে।

'যা চেঁচামেচি করলাম,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'আশেপাশের দশ মাইলের মধ্যে সবাই জেনে গেছে। বসে থেকে কোন লাভ হলো না। লোকটা নিশ্চয় চলে গেছে।'

'না, যায়নি,' মুসা বলল। 'ওই যে।'

সেভারনদের বাগানেই আছে এখনও লোকটা। বজ্রপাত, ডাল ভেঙে পড়া আর বাতাসের শব্দে বোধহয় চেঁচামেচি কানে যায়নি তার, কিংবা গেলেও মানুষের চিৎকারটা আলাদা করে বুঝতে পারেনি। হাতের ভারী জিনিসটা দেখা যাচ্ছে না। ঝুঁকে আছে ছাউনিটার ধারে। আগুন জ্বলে উঠল। একটা মুহূর্ত আলোকিত করে রাখল লোকটার মাথা।

'কি করছে?' বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন।

'বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল। 'তবে ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে না ভাল কিছু।'

আবার জ্বলে উঠল আগুন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ! ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে!'

নয়

ঝট করে সোজা হলো লোকটা। চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কে কথা বলেছে। মোরগের মত ঘাড় কাত করে রেখেছে শোনার জন্যে।

'শুনে ফেলেছে!' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে রেখে রবিন বলল।

কেরোসিন বা পেট্রলে ভেজানো কাপড়ের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে ছাউনির ওপর ছুঁড়ে মারল লোকটা। লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল লোকটা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল আগুনটা ধরছে কিনা। তারপর ঘুরে দৌড় মারল সামনের গেটের দিকে। চোখের পলকে গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

আবার আলোকিত হয়ে গেল বাগানের একটা ধার। বিদ্যুতের আলোয় নয় এবার, আগুনের। দাউ দাউ করে ধরে যাচ্ছে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'জলদি চলো!' লম্বা ঘাস মাড়িয়ে ছুটল ছাউনির দিকে।

'হোসটা ওদিকে!' কাছে পৌঁছে চিৎকার করে বলল সে। 'পেছনের দরজার ওপাশে আছে, সকালে দেখেছি।' বুঝতে পারছে তাড়াতাড়ি নেভাতে না পারলে সামার-হাউসটাতেও ধরে যাবে। 'রবিন, ট্যাপটা ছেড়ে দিয়ে এসো।'

ট্যাপ ছাড়তে গেল রবিন। কিশোর আর রবিন মিলে দ্রুত হোসপাইপটা খুলে ফেলতে শুরু করল। পানি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের দিকে পাইপের মুখ ঘুরিয়ে দিল কিশোর। কিন্তু কমার কোন লক্ষণ নেই আগুনের।

ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। কেরোসিন নয়, পেট্রল ছিটিয়েছে লোকটা। শুধু পানি দিয়ে এ আগুন নেভানো যাবে না। উপায়?

মরিয়া হয়ে সামার-হাউসের দিকে তাকাল কিশোর। দরজাটা খোলা। একদৌড়ে ঢুকে পড়ল সে। গুটিয়ে রাখা পুরানো কার্পেটটা ধরে টান দিল। নড়ে উঠল ওটা। কিন্তু একা একা টেনে বের করা খুব কঠিন কাজ।

'এই, এসো তো, ধরো আমার সঙ্গে!'

রাইরে বের করে কার্পেট দিয়ে আগুন লাগা জায়গাগুলো ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করল ওরা। সেটা আরও কঠিন কাজ। পুরানো আমলের কার্পেট, বেজায় ভারী। আগুনের ওপর ছুঁড়ে মেরে ছড়িয়ে দেয়া সহজ কথা নয়।

'নাহ্, হবে না!' আশা ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। কিন্তু কাজ বন্ধ করল না। ওপরে ছড়াতে না পেরে কম্বলের কোণা আর ধার দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল বেড়ার গায়ে। সেই সঙ্গে চলছে হোস দিয়ে পানি ছিটানো।

আগুনের আঁচে মুখের চামড়া আর চুল পুড়ে যাবার জোগাড় ওদের। ধোঁয়া বাড়ছে। ঘন হচ্ছে ক্রমে।

'কমছে, কমছে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'থেমো না। চালিয়ে যাও।'

অবশেষে নিভে এল আগুন। বাতাসে ধোঁয়া, পেট্রল আর কম্বল পোড়া উলের তীব্র গন্ধ। কম্বলটা আগুনের ওপর ফেলে রাখলে নতুন করে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। টেনে সরিয়ে এনে পা দিয়ে মাড়িয়ে পোড়া জায়গাগুলো নিভিয়ে দিতে লাগল মুসা আর কিশোর। ছাউনির যেসব জায়গায় এখনও আগুন জ্বলছে, সেসব জায়গা লক্ষ্য করে সমানে পানি ছিটিয়ে চলল রবিন। পানি লাগলেই ছাঁৎ করে ওঠে আগুন, গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে।

'ভাগ্যিস কার্পেটটার কথা মনে পড়েছিল তোমার,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ধপ করে বসে কপালে হাত বোলাতে লাগল। 'শুধু পানি দিয়ে এই আগুন কোনমতেই নেভানো যেত না।'

মুসা আর কিশোরও এসে বসল ওর পাশে। দুজনেই ক্লান্ত।

'আমরা না এলে আজ এখানে কি ঘটত কে জানে,' গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর।

'দেখো, কি পেয়েছি,' হলুদ রঙের একটা পেট্রল ক্যান তুলে দেখাল মুসা। 'কোল বাঙ্কারের ওপাশে ফেলে দিয়েছিল।' ঝাঁকি দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'অর্ধেক ভরা এখনও। সুযোগ পেলে সারা বাড়িই পুড়িয়ে দিত আজ।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'কটেজেও লাগাত।'

আঁতকে উঠল রবিন। 'ভেতরে মানুষ আছে জানা সত্ত্বেও!'

'জানা সত্ত্বেও। বড় ভয়ঙ্কর শত্রু সেভারনদের। স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করবে না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখন।'

চুপ করে ভাবতে লাগল তিনজনেই।

কটেজের পেছনের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। বেরিয়ে এলেন মিস্টার আর মিসেস সেভারন। দুজনের পরনেই শোবার পোশাক। আতঙ্কিত ভাবভঙ্গি।

ঘরের ভেতর থেকে আগুন লাগাটা নিশ্চয় দেখেছেন তাঁরা। সাহস করে বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে।

কি ঘটেছে তাঁদেরকে জানাল তিন গোয়েন্দা।

টর্চ জ্বেলে ছাউনির পোড়া জায়গাগুলো দেখাতে লাগল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়তেই এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল। একটা ব্যাজ। জ্যাকেটে লাগানো ছিল। খসে পড়ে গেছে। পরে ভালমত দেখবে ভেবে পকেটে রেখে দিল ওটা সে।

ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু আকাশের রঙ এখনও কালির মত কালো। সকাল বেলা আবার আসতে হবে, মনে মনে বলল কিশোর; এত অন্ধকারে রাতের বেলা আর কোন সূত্র খুঁজে পাওয়ার ভরসা কম।

*

'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের!' মিসেস সেভারন বললেন। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছেন।

'আপনাদের কার্পেটটা গেল,' প্রশংসা-পর্বটা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে বলল রবিন।

'যায় যাক,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'পড়েই তো ছিল, বরং একটা জরুরী কাজে লাগল।'

'এখন তো পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার,' গরম চকলেটের মগে চুমুক দিতে দিতে বলল মুসা। 'ব্যাপারটা এখন বিপজ্জনক হয়ে গেছে। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা। এখনও সাবধান না হলে শেষে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'না,' পুলিশকে জানাতে এখনও আপত্তি আছে মিস্টার সেভারনের, 'নিজেরাই সামলাতে পারব আমরা। তোমরা আমাদের সাহায্য করছ, এতেই হবে, পুলিশকে আর দরকার নেই।'

ভুরু তুলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। অসহায় ভঙ্গি করল মুসা। সেভারনদের অনুমতি ছাড়া পুলিশের কাছে যেতে পারছে না ওরা।

হাত ধোয়ার ছুতো করে বেরিয়ে গেল কিশোর। বাথরুম থেকে ফেরার পথে হলে ঢুকে টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চিঠিগুলো এখনও আগের জায়গাতেই আছে। সেভারনদের ব্ল্যাকমেল করার মাধ্যম যদি চিঠি হয়ে থাকে, অর্থাৎ চিঠি দিয়ে যদি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে অগাস্ট শাজিন, তাহলে প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিফোন এবং চিঠি, দু'ভাবেই হুমকি দিয়ে সেভারনদের জ্বালাতন করছে মহিলা।

খুঁজতে শুরু করল কিশোর।

রান্নাঘরে কথা শোনা যাচ্ছে। বেরোনোর আগে রবিনকে চোখ টিপে বেরিয়েছিল কিশোর। ইঙ্গিতটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে রবিন, বুড়োবুড়িকে কথা বলে ব্যস্ত রেখেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর।

প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির লোগো ছাপ মারা একটা খাম। তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল

কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।

দ্রুতহাতে খামটা খুলে চিঠি বের করে তাতে চোখ বোলাল। লিখেছে : এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে সোজা পুলিশকে গিয়ে বলব শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিস থেকে টাকা চুরি করে সেই টাকা দিয়েই কটেজটা কিনেছে তোমাদের ছেলে জ্যাকি, টাকাগুলো সেজন্যেই পাওয়া যায়নি। কটেজটা তোমরা এমনিতেও রাখতে পারবে না, যেভাবেই হোক দখল করে নেয়া হবে; জেদ করে অহেতুক বিপদ আর ঝামেলা বাড়াবে শুধু শুধু। তারচেয়ে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই তোমাদের জন্যে সবদিক থেকে উত্তম।

তাহলে এই ব্যাপার! ভাল বুদ্ধি বের করেছে শাজিন। নিজের অজান্তেই মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। পুলিশ যদি বিশ্বাস করে বসে চোরাই টাকা দিয়ে কটেজ কেনা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করবে বাড়িটা। তারপর নীলামে বেচে দেবে কোম্পানির টাকা পরিশোধ করার জন্যে। কোম্পানিই তখন কিনে নেবে কটেজ আর আশেপাশের সমস্ত জায়গা।

উত্তেজনায় বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে কিশোরের। চিঠিটা আবার খামে ভরে রেখে দিল আগের জায়গায়।

পেছনে খুট করে শব্দ হতেই চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল সে। মিস্টার সেভারন দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

চোখে চোখ পড়তেই রাগত স্বরে বললেন, 'এখানে কি করছ? ব্যক্তিগত চিঠি পড়ছিলে কেন? আমাদের মুখ থেকে শুনে কি বিশ্বাস হচ্ছিল না?'

'সরি...' পেছন থেকে বলে উঠল রবিন। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। 'ওপরতলায় আমি হাত ধুতে যাওয়ার সময় ধাক্কা লেগে উল্টে পড়েছিল টেবিলটা। তুলে সোজা করে রেখেছিলাম বটে, তবে চিঠিপত্রগুলো সব মেঝে থেকে তোলা হয়নি। তাড়াহুড়োয় তখনকার মত বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিশোরকে বলেছি ঠিক করে সাজিয়ে রাখতে।'

আটকে রাখা দমটা সশব্দে ছাড়ল কিশোর। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে। বুদ্ধি করে বাঁচিয়ে দিল।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন মিস্টার সেভারন। 'সত্যি বলছ, চিঠিগুলো পড়োনি?'

'অ্যাঁ...' সরাসরি মিথ্যে বলতে বাধছে, একটা জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে কিশোর যেটা বললে প্রশ্নটা এড়ানো যাবে, আবার মিথ্যেও বলা হবে না।

এবার বাঁচাল মুসা। হলঘরের কথা সে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, রবিনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিশোর, ক'টা বাজল খেয়াল আছে? রাত তিনটে। মা কোন কারণে আমার ঘরে আমার খোঁজ করতে গিয়ে যদি না দেখে, সারা বাড়ি মাথায় করবে...'

'অ্যাঁ!' হাতঘড়ি দেখে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল কিশোর। সেভারনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিঠিগুলোর জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার সেভারন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' টেবিল থেকে চিঠির বান্ডিল তুলে নিলেন

মিস্টার সেভারন। হলুদ লোগোওয়ালা চিঠিটা বের করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করলেন খোলা হয়েছে কিনা। নীরস কণ্ঠে বললেন, 'যতবারই আসা যাওয়া করি এখান দিয়ে, চিঠিগুলো চোখে পড়ে, দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি…'

গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। কয়লার চুলার ঢাকনা খোলার শব্দ শুনল তিন গোয়েন্দা, তারপর সশব্দে বন্ধ হলো আবার।

'পুড়িয়ে ফেললেন!' চোখের চারপাশ কুঁচকে গেছে রবিনের।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'বোকার মত প্রমাণগুলোকে নষ্ট করলেন। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই আমাদের। চলো, যাই।'

ওরা বেরোনোর সময় সামনের দরজা লাগিয়ে দিতে এলেন মিসেস সেভারন। কিশোর বলল, 'যোগাযোগ রাখবেন। সাহায্যের প্রয়োজন মনে করলে খবর দেবেন আমাদের।'

*

রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'চিঠিটাতে কি লেখা ছিল?'

জানাল কিশোর।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এত্তবড় শয়তান মহিলা তো আর দেখিনি! আমরা এখন কি করব?'

'ওই মহিলার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করব। জ্যাকিকে যে ফাঁসানো হয়েছে, এটা প্রমাণ করতে পারলে ওকে তো বের করা যাবেই, মহিলাকেও জেলের ভাত খাওয়ানো যাবে। তাতে সেভারনদের বাড়িটাও বাঁচবে।'

'কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব?'

'শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিসে গিয়ে তদন্ত করা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

'গেলেই কি আর তদন্ত করতে দেবে নাকি?'

'না, দেবে না। গোপনে করতে হবে কাজটা।'

'কিন্তু ঢোকার জন্যেও তো একটা ছুতো দরকার,' রবিন বলল। 'এই, এক কাজ করলে কেমন হয়? স্কুলের প্রোজেক্টের কাজ নিয়ে গেছি বলব। বলব, রকি বীচের উন্নয়ন নিয়ে বিল্ডিং কোম্পানিগুলো কি ভাবনা-চিন্তা করছে সেটা জানতে গেছি। সুযোগ দিলে অগাস্ট শাজিনের একটা সাক্ষাৎকারও নেব।'

'বুদ্ধিটা ভালই। কিন্তু…'

'কিন্তু কি?'

'ব্যালাক্লাভা পরে এসেছিল যে লোকটা, সে তখন অফিসে থাকলে আমাদের চিনে ফেলবে।'

'মুসাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনবে, এটা ঠিক। আমাদের দুজনকে না-ও চিনতে পারে। ওকে নেব না, তাইলেই হবে। কিংবা আরও এক কাজ করা যায়, আমি একাই যাব। রাস্তায় গাড়িটা ছুটে আসার সময় তুমি সামনে ছিলে, তোমাকে দেখার সম্ভাবনা বেশি; আমাকে কম, তাই আমি একা…'

'তারপরেও ঝুঁকি থেকে যায়...'

'গোয়েন্দাগিরিতে ঝুঁকি থাকবেই, তাই বলে কি পিছিয়ে যেতে হবে?' বহুবার বলা কিশোরের কথাটাই কিশোরকে ফিরিয়ে দিল রবিন।

হেসে ফেলল কিশোর, 'নিলে একচোট। ঠিকই বলেছ, ঝুঁকির ভয়ে পিছিয়ে গেলে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেয়া উচিত।'

'তাহলে কখন যাচ্ছি?'

'কাল সকালেই যাও।'

দশ

পরদিন সকালে ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটের এক কানাগলিতে ঢুকল রবিন। ঠিকানা দেখে বাড়িটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। বাড়ির পেছনে নদী। কিংবা বলা যায় নদীর পাড়ে বাড়িটা, মুখটা অবশ্য রাস্তার দিকে ফেরানো। সামনের দরজায় একটা নোটিশ টানানো, তাতে বলা হয়েছে লিফট নষ্ট। পড়তে গিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল রবিনের। ইংরেজিতে টাইপ করা লেখাগুলোর 'ও' অক্ষরটা সবখানেই ক্যাপিটল্ লেটারে। সেভারনদের বাড়িতে পাওয়া চিঠির লেখার মত। কাজে লাগতে পারে ভেবে নোটিশটা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিল সে।

সাবধানে ঠেলা দিল দরজায়। ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল সে। ম্লান আলোকিত একটা হলওয়ে।

সামনে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙের বার্নিশ নষ্ট হয়ে গেছে, চটা উঠে গেছে কাঠের। লিফটের দরজায় আরেকটা নোটিশ : লিফট অচল।

নাক কুঁচকাল রবিন। বহুকাল ধরে পরিষ্কার না করলে, অযত্ন অবহেলায় ফেলে রাখলে এ রকম গন্ধ হয়।

সিঁড়ির পাশে দেয়ালে প্লাস্টিকের ফলকে লেখা রয়েছে, শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিসটা তিনতলায়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে কাউকে দেখল না। একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। তারপর চুপচাপ।

নিচতলা কিংবা দোতলার অন্য কোন অফিসে ঢুকেছে লোকটা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলে আবার উঠতে শুরু করল সে।

তিনতলায় উঠে সামনে একটা দরজা দেখতে পেল। দ্বিধা করে ঠেলা দিল পাল্লায়। খুলে যেতে ভেতরে পা রাখল।

অফিস নয়, ঢুকেছে একটা ছোট রান্নাঘরে। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। এখানেও অযত্নের ছাপ। নোংরা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সিংক।

ছোট একটা টেবিলে রাখা একটা কালি লাগা কেটলি, পাশে চা-পাতার ব্যাগ। গোটা তিনেক কাপ-পিরিচ আছে।

মেঝেতে চোখ পড়ল ওর। আটকে গেল দৃষ্টি। ধুলোয় ঢাকা ময়লা মেঝেতে জুতোর ছাপগুলো চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছে? মনে পড়ল। সেভারনদের বাগানে। জুতোর সোল অবিকল এক রকম। গোড়ালিতে গোল গোল চক্র। রাতের বেলা চুরি করে যে লোক বাগানে ঢুকেছিল সে এসেছিল এ ঘরে! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অকাট্য প্রমাণ। একই ডিজাইনের জুতো অনেকেই পরতে পারে ভেবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল সম্ভাবনাটা, কিন্তু খুঁতখুঁতি গেল না মন থেকে। এককোণে একটা কাঠের আলমারি দেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে হুক থেকে ঝুলছে একটা কালো রঙের জ্যাকেট। ঘরের একমাত্র জানালাটায় উঁকি দিয়ে বাইরে একটা ফায়ার এসকেপ দেখতে পেল।

এ ঘরে আর কিছু দেখার নেই। তবে যা দেখেছে, অনেক। বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। পাশে দুটো দরজার পরে আরেকটা দরজা দেখল, পাল্লার গায়ে লেখা রয়েছে 'অফিস'।

দম নিয়ে আস্তে করে টোকা দিল দরজায়। সাড়া এল ভেতর থেকে, 'আসুন।'

পাল্লাটা ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল সে, 'হাই।'

টেলিফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বসে আছে এক তরুণী, রিসিপশনিস্ট। রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসল, চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করল।

হাতের ফাইলটা কোলের ওপর রেখে নিরীহ ভঙ্গিতে বসে পড়ল রবিন। চারপাশে তাকাতে গিয়ে চোখ পড়ল পাশের একটা দরজার ওপর, তাতে নেমপ্লেটে লেখা 'অগাস্ট শাজিন'-এর নাম। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লাটা। টেবিলে রাখা একটা টাইপরাইটারের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' ফোনে কথা বলছে তরুণী। 'কাল রেডি হবে? হবে তো?...ঠিক আছে, আমি নিজেই আসব নিতে...না ভাই, তাড়াতাড়ি দরকার। বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিতে নিতে আর ভাঙা টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করতে করতে জান শেষ হয়ে গেল।'

ডেস্কে রাখা কতগুলো কাগজ দেখতে পেল রবিন। শর্টহ্যান্ডে কি সব লেখা।

'ধন্যবাদ,' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল তরুণী। রবিনের দিকে তাকাল, 'বা?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রবিন। মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো। বলল, 'আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। স্কুলের একটা প্রোজেক্টের জন্যে তথ্য জোগাড় করতে এসেছি আমি। স্থানীয় কন্ট্রাক্টর আর বিল্ডাররা আগামীতে শহরটাকে উন্নত করার জন্যে কি কি প্ল্যান করেছে সে-সম্পর্কে জানতে চাই। আগামী দশ বছরে কি কি করছে তারা।'

রবিনের কথা শুনে খুশি মনে হলো রিসিপশনিস্টকে। 'অনেক কাজই করবে, অন্তত আমাদের কোম্পানি। শহরের পশ্চিম ধারে বড় বড় কতগুলো শপিং সেন্টার আর হাউজিং এস্টেট বানানোর পরিকল্পনা আছে আমাদের। কিন্তু সমস্যা হয়েছে জায়গা নিয়ে। কিছু কিছু বাসিন্দা তাদের জায়গা বিক্রি করতে নারাজ। কোনমতেই তাদের বোঝানো যাচ্ছে না।'

'তাই নাকি?' ভুরু উঁচু করল রবিন। 'তাইলে তো আর হচ্ছে না।'

দ্বিধা করল রিসিপশনিস্ট। 'অবশ্য, মিসেস শাজিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একবার যেটা ধরেন সেটা শেষ না করে তিনি ছাড়েন না। ম্যানিলা রোডের ধারে যে বন আছে, ম্যানিলা উড, সেটা পরিষ্কার করে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বানানোরও ইচ্ছে আছে তাঁর। সবচেয়ে ঝামেলাটা হচ্ছে ওখানকার জমি নিয়েই।'

কান খাড়া করে ফেলল রবিন। 'কি ধরনের ঝামেলা?'

'এক বুড়োর অনেকখানি জায়গা আছে ওখানে। সে ওটা ছাড়তে চাইছে না। এদিকে ভূমি অফিস থেকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে আগামী তিন দিনের মধ্যে যদি মালিকানার দলিল দাখিল করতে না পারেন মিসেস শাজিন, ওই জায়গার মালিক আর হতে পারবেন না। অনুমতিপত্র বাতিল করতে হবে। আবার নতুন করে দরখাস্ত করতে হবে তাঁকে।'

'হুঁ, নিজের জায়গা না হলে ঝামেলাই। অন্যের জায়গার ওপর কিছু করার চিন্তা করে আগে থেকেই প্ল্যান করে বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

'তা ঠিক,' নড়েচড়ে উঠল রিসিপশনিস্ট। 'তোমার বোধহয় আরও কিছু জানা বাকি আছে? এক কাজ করো, পেছনের অফিসটায় চলে যাও। অনেক পরিকল্পনার নীলনকশা আর তথ্য লেখা কাগজ দেয়ালে সাঁটানো আছে, ওগুলো দেখে জেনে নাওগে। আমার জরুরী কাজ আছে।' ডেস্কে রাখা কাগজগুলো দেখিয়ে বলল, 'এ চিঠিগুলো টাইপ করতে হবে। মিসেস শাজিন এসে ঠিকমত না পেলে রেগে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' উত্তেজনা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে রবিন। এ ভাবে তাকে ঢালাও সুযোগ দিয়ে দেবে রিসিপশনিস্ট, ভাবতে পারেনি।

'ইচ্ছে করলে ফটোকপিও করে নিতে পারো,' তরুণী বলল। 'পুরানো প্ল্যানের কপিও পাবে তাকে রাখা ফাইলে। সেগুলোও দেখতে পারো। ফাইলিং কেবিনেটের পাশেই পাবে ফটোকপির মেশিন।'

রিসিপশনিস্টকে আরও একবার ধন্যবাদ দিল রবিন।

পেছনের ঘরে এসে ঢুকল। কাগজপত্র দেখে দেখে দ্রুত কিছু নোট নিল। যদি রিসিপশনিস্ট দেখতে চায় যাতে দেখাতে পারে। কোন নোটই না নিলে সন্দেহ করে বসতে পারে। এখান থেকেই শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে। রিসিপশনিস্টের কথা কানে এল।

'ডেড ফাইলস' লেখা কেবিনেটটা টান দিয়ে খুলল রবিন। কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল। গায়ে 'জারভিস' লিখে রাখা একটা ফাইল দৃষ্টি আকর্ষণ

করল। মনে পড়ল, সেভারনদের আগে কটেজটার মালিক ছিল জারভিস নামে এক লোক।

ফাইলটা বের করে এনে খুলল সে। সেভারনদের জায়গাটাতে কি করা হবে, তার দুটো প্ল্যান পাওয়া গেল। মেশিনে ঢুকিয়ে দুটো প্ল্যানেরই একটা করে কপি করে নিল সে। আরও কিছু কাগজপত্রের কপি করে নিল, যাতে রিসিপশনিস্ট দেখলেও বুঝতে না পারে ঠিক কোন কাগজগুলোতে রবিনের আগ্রহ। ফাইলগুলো আবার ঢুকিয়ে রাখল আগের জায়গায়। রাখতে গিয়েই নজরে পড়ল আরেকটা সবুজ ফাইল। কৌতূহলী হয়ে বের করে আনতে যাবে এই সময় অফিসরুমে কথা শোনা গেল।

'চলে এসেছেন,' রিসিপশনিস্ট বলল। 'এত সকালে আসবেন তা তো বলেননি।'

'হ্যাঁ, ডরোথি, আসতে হলো,' শোনা গেল অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ। 'জরুরী আরও কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। ডিকটেশন মেশিন আর কম্পিউটারটা এসেছে?'

'না, রেডি হয়নি এখনও। কাল গিয়ে আনতে বলেছে।'

'তাই নাকি। তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল...'

নিশ্চয় অগাস্ট শাজিন। দেখার জন্যে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল রবিন। কালো জিনস আর কালো শার্ট পরা লম্বা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে শাজিনের অফিসের সামনে। একটা হাত দরজার নবে। কুচকুচে কালো চুল। চোখও তেমনি কালো। গায়ের রঙ মোমের মত সাদা। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক। হরর ছবির ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—ড্রাকুলার স্ত্রী।

মাথার চুল সরানোর জন্যে হাত তুলল শাজিন। হাতের তালুতে প্লাস্টার দেখতে পেল রবিন। যখম-টখম হলে এ রকম প্লাস্টার লাগায়।

'ডরোথি, এক কাপ কফি দেবে? আর আগের চিঠিগুলো নিয়ে এসো তো একটু আমার অফিসে। কিছু অদল-বদল দরকার।'

অফিসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল শাজিন। আর দেরি করল না রবিন। বেরিয়ে এল পেছনের ঘর থেকে।

'পেয়েছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

'হ্যাঁ,' নিচুস্বরে জবাব দিল রবিন। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কয়েকটা কাগজের কপিও করে নিয়েছি। দেখতে চান?'

ডরোথি দেখতে না চাইলেই খুশি হয় রবিন। ভয় পাচ্ছে, কোন সময় বেরিয়ে চলে আসে শাজিন, দেখে ফেলে তাকে। আপাতত ওর সামনে পড়তে চায় না। মহিলাকে দেখেই ওর সামনে যাওয়ার চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিয়েছে সে। থাক তো সাক্ষাৎকার নেয়া।

হাত নাড়ল ডরোথি, 'লাগবে না। নিয়ে যাও।'

আরও একবার ধন্যবাদ আর সেই সঙ্গে 'গুডবাই' জানিয়ে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এল রবিন। দ্রুতপায়ে নিচে নামতে শুরু করল।

বাইরে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল। অনেকক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে। চিন্তায় পড়ে

গেছে নিশ্চয় মুসা আর কিশোর।

*

'ম্যানিলা রোডে উন্নয়নের প্ল্যানটা পাওনি?' জানতে চাইল কিশোর। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসেছে ওরা।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অফিসেই রয়ে গেছে হয়তো এখনও। রিসিপশনিস্ট বলল, তিনদিনের মধ্যে জমির মালিকানার দলিল জমা দিতে না পারলে ওদের অনুমতিপত্র বাতিল হয়ে যাবে।'

'এ জন্যেই মরিয়া হয়ে উঠেছে ড্রাকুলাটা,' মুসা বলল। রবিনের মুখে শাজিনের বর্ণনা শুনে প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছিল, মহিলাটা আসল ড্রাকুলাই নয় তো? তবে পরে মনে পড়েছে, আসল ভ্যাম্পায়াররা দিনের আলোয় বেরোতে পারে না। শাজিন বেরিয়েছে, তারমানে সে আসল ভ্যাম্পায়ার নয়, মানুষরূপী ভ্যাম্পায়ার—নইলে সেভারনদের মত এত নিরীহ বুড়ো মানুষকে অত্যাচার করতে পারে! তবে তার মতে আসল ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে মানুষ-ভ্যাম্পায়াররা অনেক বেশি খারাপ।

ছিঁড়ে আনা নোটিশটা দেখল কিশোর। সেভারনদের হুমকি দিয়ে লেখা নোটটা বের করল। দুটোতেই 'ও' অক্ষরটা অবিকল এক রকম।

'শাজিনের টেবিলে একটা পুরানো টাইপরাইটার দেখেছি,' রবিন জানাল, 'নিশ্চয় ওটা দিয়ে টাইপ করেছে। ওদের কম্পিউটার বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে বা কোন কিছু, পচা টাইপরাইটার দিয়ে তাই চিঠি টাইপ করেছে।'

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর। 'তাহলে রান্নঘরের মেঝেতে জুতোর ছাপও দেখেছ?'

'হ্যাঁ। যে লোক রাতে এসে সেভারনদের বাগান তছনছ করেছে, সেই লোক ঢুকেছিল শাজিনের অফিসের রান্নাঘরে, জ্যাকেট লুকিয়ে রেখেছে আলমারিতে।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'সেভারনদের কটেজের নকশাটা কপি করে এনেছ কেন?'

'কৌতূহল হলো, তাই। ভাবলাম, নকশা দেখে সেলার আর ভুতুড়ে ঘরটায় খোঁজাখুঁজি করতে সুবিধে হবে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, হারিয়ে গেছে গভীর চিন্তায়।

এগারো

পরদিন সকালে ফায়ারের পিঠে চেপে সেভারনদের বাড়ি রওনা হলো মুসা।

সুন্দর সকাল। মাঠ আর ঝোপঝাড় থেকে ওঠা ভোরের কুয়াশার সবে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে সোনালি রোদের বর্শা। দৃপ্তপায়ে হেঁটে চলেছে

পেশীবহুল, খয়েরী রঙের ঘোড়াটা।

সামনে ঝুঁকে চকচকে গলাটায় চাপড়ে দিয়ে বলল মুসা, 'কতদিন ঠিকমত দৌড়াই না, নারে? জায়গাই নেই সেরকম। আজ পেয়েছি। মনের সুখে দৌড়ে নেব।'

যেন মুসার কথা বুঝে সায় দিতেই মাথা ঝাড়ল ফায়ার।

কটেজের পাশ দিয়ে ওকে নিয়ে বনের দিকে এগোল মুসা। নেচে নেচে এগোচ্ছে ফায়ার। নাক উঁচু করে দুই ফুটো ছড়িয়ে তাজা বাতাস টানল বুক ভরে, অস্থির ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়ল আরেকবার।

'অত অস্থির হচ্ছিস কেন?' আদর করে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল মুসা, 'জায়গামত আসিনি এখনও।' শক্ত করে জিনের ওপর চেপে বসল সে। লাগামটায় আঙুলের চাপ শক্ত করে পা টান টান করে দিল রেকাবে। দৌড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে।

গেট পেরিয়ে এসেই হাতে পেঁচিয়ে খাটো করে ফেলল লাগামটা। জোরে চলার ইঙ্গিত করল ফায়ারকে। মুসাদের বাড়ি থেকে হেঁটে এসে ইতিমধ্যেই গা গরম হয়ে গেছে ঘোড়াটার। মুহূর্তে দৌড়ানো শুরু করল।

দক্ষ ঘোড়সওয়ারের মত ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখল মুসা। বেশি জোরেও ছুটল না, বেশি আস্তেও না। হেসে বলল, 'ওভাবে পেশী ফোলাচ্ছিস কেন? উড়তে চাস? থাক, পঙ্খীরাজ হওয়ার দরকার নেই। যেভাবে বলছি সেভাবেই চল।'

কিন্তু জোরে ছোটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ঘোড়াটা। শেষে রাশ খানিকটা ঢিল করে ওকে ছুটতে দিল মুসা। মুহূর্তে যেন উড়ে এসে বনের রাস্তায় ঢুকল ফায়ার। সামনে ঝুঁকে বসে রইল মুসা। রেকাবে আরও টান টান হয়ে গেছে পা। সে-ও ছোটার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু অচেনা পথে জোরে ছুটতে অস্বস্তি হতে লাগল তার। দৌড়ানো থামাল ফায়ারের। দুলকি চালে চলল কয়েক মিনিট। শেষে আবার হাঁটাতে শুরু করল আগের মত। হাত লম্বা করে আস্তে চাপড়ে দিল ঘোড়াটার ঘামে ভেজা ঘাড়।

'দারুণ ছুটতে পারিস তুই, ফায়ার!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের কপাল থেকেও ঘাম মুছল মুসা। 'সত্যি, প্রশংসা করার মত!'

রেকাবে পায়ের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল সে। পা দুটো ছড়ানোর জন্যে। চোখে পড়ল সাদা ভ্যানটা। আগের দিন যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি করছে ও, এত সকালে! প্রথমেই এই ভাবনাটা এল মুসার মাথায়। নিশ্চয় উঁকিঝুঁকি মারতে এসেছে সেভারনদের বাড়িতে। আরও অঘটন ঘটানোর তালে আছে।

ঘোড়া থেকে নামল সে। মাথার টুপিটা খুলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। ফায়ারকে বাঁধল গাছের সঙ্গে। গলাটা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'থাক এখানে, ফায়ার, ঘাস খা। আমি গিয়ে ভ্যানটা দেখে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোল গাড়িটার

দিকে। পেছনে আঁকা সেই লোগো, এখন আর অপরিচিত নয়। জানালা দিয়ে ভেতরে দেখল। পেছন দিকে এসে হাতল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

'খাইছে!' আপনমনেই বলে উঠল সে, 'ভাগ্যটা ভালই আমার!'

আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে উঠে বসল ভ্যানের মধ্যে। লাগিয়ে দিল দরজাটা।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা শটগান। পাশে রাখা এক বাক্স কার্তুজ। জানে কি দেখবে, তবু সন্দেহ নিরসনের জন্যে ডালাটা খুলে দেখল। সেদিন এই কার্তুজ দিয়েই গুলি করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই। দুটো কার্তুজ তুলে নিয়ে পকেটে রাখল। চোখ বোলাল আর কি আছে দেখার জন্যে। এক কোণে একটা প্লাস্টিকের কনটেইনার, গায়ে মড়ার খুলি আর ক্রসবোন আঁকা স্টিকার লাগানো। মুখটা খুলে গন্ধ শুঁকল। পোকা মারার বিষ। একই রকম গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল সেভারনদের বাগানের পুকুরে।

হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। ঘুরতে এসে শাজিনদের বিরুদ্ধে এ রকম জোরাল প্রমাণ পেয়ে যাবে আশা করেনি। ভ্যান-চালকের চেহারাটা এখন দেখা দরকার, চিনে নেয়া দরকার, তারপর নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

গাড়ি থেকে নামতে যাবে, এই সময় কানে এল পায়ের শব্দ। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল সে। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে গেল। আতঙ্কিত হয়ে শুনতে পেল, ইগনিশনে চাবি ঢোকানোর শব্দ এবং তারপর ইঞ্জিনের গর্জে ওঠা। মুসা কোন কিছু করার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি। গতি বেড়ে গেল মুহূর্তে। অসহায় হয়ে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

*

একভাবে পড়ে আছে মুসা। মাথা তুললেই আয়নায় তাকে দেখে ফেলবে ড্রাইভার। ফলে লোকটার চেহারা দেখার জন্যেও মাথা তুলতে পারছে না।

মিনিট দশেক এক গতিতে গাড়ি চালিয়ে এসে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। দরজা খুলে নামল। দড়াম করে লাগিয়ে দিল। সরে যেতে লাগল পায়ের শব্দ।

সব যখন চুপচাপ হয়ে গেল আবার, আস্তে মাথা তুলল মুসা। পেছনের জানালা দিয়ে তাকাল। রাস্তার ধারে বড় একটা বাড়ির সামনে থেমেছে গাড়িটা। রাস্তাটার দুই ধারেই গাছের সারি।

কোথায় এল সে? আশেপাশে তাকিয়ে চিনতে পারল না জায়গাটা। ড্রাইভারকে দেখা গেল না, তবে বাড়ির দোতলার জানালায় ছায়া নড়তে দেখল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

আলো লাগছে চোখে। কপালের সামনে হাত এনে রোদ বাঁচিয়ে ভালমত তাকাল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-আয়নায় চেহারা দেখে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে এক মহিলা। লম্বা কালো চুল, মোমের মত সাদা চামড়া। শাজিনকে দেখেনি সে, রবিনের কাছে চেহারার বর্ণনা শুনেছে। মহিলাকে দেখেই এখন

বুঝল, ও শাজিন ছাড়া আর কেউ নয়। ভ্যাম্পায়ারের কথা ভেবে কাঁটা দিল গায়ে। 'দিনের বেলা বেরোয় না ওই রক্তচোষা ভূত' মনকে বুঝিয়ে জোর করে ভয় তাড়াল।

জানালার কাছ থেকে মহিলা সরে যেতেই দরজাটা খুলল সে। লাফ দিয়ে নামল। আবার লাগিয়ে দিল দরজা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল কেউ লক্ষ করছে কিনা। সরে এসে ভ্যানটাকে সামনে রেখে আড়াল করে বসে তাকাল আবার বাড়িটার দিকে।

চিৎকার শোনা গেল এই সময়। দেখল বাগানের রাস্তা ধরে তার দিকেই দৌড়ে আসছে মহিলা। বোঝা গেল, কোনভাবে দেখে ফেলেছে।

আর বসে থাকতে সাহস করল না মুসা। উঠেই দিল দৌড়।

'এই এই, শোনো!' চিৎকার করে ডাকল মহিলা।

ফিরেও তাকাল না মুসা।

*

রাস্তার শেষ মাথায় দেখতে পেল একটা পাবলিক পার্কে ঢোকার লোহার গেট। ওর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে গাছের আড়ালে বা অন্য কোথাও লুকাতে পারবে। ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। পেছন পেছন দৌড়ে আসছে মহিলা। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবল মুসা, ফায়ার কাছাকাছি থাকলে লাফ দিয়ে গিয়ে এখন ওর পিঠে চড়ে বসতে পারত।

পার্কের মধ্যে এক জায়গায় ছুটাছুটি করে খেলছে বাচ্চারা। তাদের কাছে দৌড়ে এসে একটা স্লিপারের আড়ালে বসে পড়ল মুসা। আশা করল তাকে দেখতে পাবে না মহিলা।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল। আস্তে করে মাথা বের করে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে হেঁটে চলল মহিলা।

হাঁপ ছাড়ল মুসা।

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তাকে ঘিরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে বাচ্চারা। একটু আগে যেটা স্বস্তির কারণ হত, সেটা এখন বিরাট অস্বস্তি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল উল্টোদিকের গেটের দিকে। প্রথমে জানতে হবে কোন জায়গায় তাকে নিয়ে এসেছে শাজিন, তারপর যেতে হবে ফায়ারকে আনতে।

পার্ক থেকে বেরোতে গেটের ওপরের লেখা দেখে জানতে পারল, জায়গাটার নাম অগাস্টভিল।

ম্যানিলা রোডে পৌঁছে বনের ভেতর থেকে ফায়ারকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আরেক ঘটনা ঘটল। ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ করে সামনে এসে দাঁড়াল সেই লোকটা, দূরবীন হাতে যাকে সেদিন সেভারনদের বাড়ির

ওপর নজর রাখতে দেখা গিয়েছিল। এমন করে বেরোল, চমকে দিল ঘোড়াটাকে, ঘাবড়ে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল ওটা। কয়েকবার পিঠ থেকে পড়তে পড়তে বাঁচল মুসা।

বারো

সকালবেলা এত কিছু করে ফিরে আসার পর সেদিন আর সেভারনদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করল না তার। রবিনও কাজে ব্যস্ত, ফোনে কিশোরকে জানিয়ে দিল, সে-ও যেতে পারবে না।

বিকেল বেলা ইয়ার্ডে এসে সকালের সমস্ত ঘটনার কথা কিশোরকে খুলে বলল মুসা।

শনিবার সকালে নাস্তা সেরেই সেভারনদের বাড়িতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। আগের দিন বিকেলে ফোনে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছে কিশোর। লাইন না পেয়ে শেষে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, তাঁদের ফোন নষ্ট।

'আজ নিশ্চয় মেরামত করে ফেলবে,' সাইকেল চালাতে চালাতে দুই সহকারীকে বলল কিশোর।

কটেজে পৌঁছে দরজায় বার বার টোকা দিয়েও কোন সাড়া পেল না।

'মিসেস সেভারন!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখল দুধের দুটো খালি বোতল। একটাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ রবারের ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। জানালার দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে বলল সে, 'মিসেস সেভারন, আমি কিশোর!'

কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কই, কেউ তো জবাব দিচ্ছে না,' মুসাও মোরগের মত ঘাড় বাঁকা করে কান পেতে রেখেছে।

'ঘুম থেকে ওঠেননি হয়তো এখনও,' হাতঘড়ি দেখল রবিন। 'এখনও অনেক সকাল। বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কি করবে বুঝতে পারছে না। গাড়ি নিয়ে হাজির হলো দুধওয়ালা। গাড়ি থেকে নেমে দুধের বোতলের খাঁচা হাতে শিস দিতে দিতে এগোল কটেজের দিকে।

'হাই,' তার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'হাই,' কাছে এসে দাঁড়াল দুধওয়ালা। কৌতূহলী চোখে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'দেখা করতে এলে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি, খুলছেন না।'

'এতক্ষণে তো রোজ উঠে পড়েন ঘুম থেকে। আরও জোরে ধাক্কা দাও।' খাঁচাটা নামিয়ে রেখে খালি বোতলের গায়ে আটকানো কাগজটা খুলে নিয়ে

পড়ল দুধওয়ালা। 'এক লিটার বেশি দিতে বলেছেন।' আনমনে বিড়বিড় করল, 'মেহমান এসেছে নাকি! কখনোই তো আসে না।' খাঁচা থেকে তিনটা বোতল বের করে সিঁড়িতে রাখল সে। খালি বোতল দুটো তুলে খাঁচার খোপে রাখল। কি মনে করে লেটার-বক্সটার দিকে তাকাল। 'খবরের কাগজটা নেই। তারমানে উঠে পড়েছেন তাঁরা।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের ডাক শুনতে পাননি। আরও জোরে ধাক্কা দাও।' খাঁচাটা তুলে নিয়ে আবার শিস দিতে দিতে চলে গেল সে।

'দাঁড়াও,' মুসা বলল, 'পেছনে গিয়ে দেখে আসি বাগানে বেরোলেন কিনা।'

বাড়ির পাশ ঘুরে এসে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল মুসা। বাড়ির ভেতর থেকে কথা কানে এসেছে। এত সকালে টিভি অন করে দিয়ে বসে আছেন নাকি? সেজন্যে ওদের ডাক শুনতে পাননি?

সামার-হাউসের দরজা খোলা। ওখানে নেই তো মিস্টার সেভারন? উঁকি দিয়ে দেখতে গেল।

কিন্তু সামার-হাউসটা খালি। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও ফিরে তাকাল আবার। কোথায় যেন অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। কোনটা অস্বাভাবিক লেগেছে, ধরতে সময় লাগল না। কার্পেটটা বিছানো নেই মেঝেতে, আগুন নেভানোর জন্যে রাতে ওরা বের করে নিয়ে যাওয়ার পর আর বিছানো হয়নি। বাইরেই ফেলে রেখেছে। কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে মেঝেটা।

কি ভেবে দরজাটা ঠেলে আরও ফাঁক করল সে। পুরানো কাঠের বাক্স আর জঞ্জালের গন্ধ। আপেল রাখার পুরানো কয়েকটা কাঠের বাক্স ফেলে রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে, আর গোটা দুই ভাঙা ডেকচেয়ার। ভুরু কুঁচকে জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে লাগল সে।

ট্র্যাপ-ডোরটা চোখে পড়তে দম বন্ধ করে ফেলল। তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। আগের বার যখন এসেছিল, কাঠের মেঝে ঢাকা ছিল কার্পেটটা দিয়ে। সেজন্যে দেখা যায়নি ওটা।

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নামল বাগানে। উত্তেজনায় কাঁপছে। খবরটা বন্ধুদের জানানোর জন্যে ছুটল।

*

সামার-হাউসে ঢুকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ট্র্যাপ-ডোরটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে।

'কোথায় নেমেছে?' বলে হাঁটু মুড়ে ওটার সামনে বসে পড়ল রবিন। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল নিচের দিকে। মেঝে আর ট্র্যাপ-ডোরের মাঝের ফাঁকে আঙুল ঢোকানোর চেষ্টা করল। না পেরে বলল, 'কিছু একটা দরকার। চাড় মেরে তুলতে হবে।'

'ও, ভুলে গিয়েছিলাম,' মুসা বলল, 'কটেজের মধ্যে কথার আওয়াজও শুনেছি। হয় টিভি চালানো হয়েছে, নয়তো কথা বলেছেন সেভারনরাই। বেশি

ভেতরের দিকে রয়েছেন, নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত, সেজন্যেই আমাদের ডাক শুনতে পাননি।'

'কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই খুলছেন না কোন কারণে।'

ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে কিশোর। একটা বাক্সের নিচে ডাল ছাঁটার পুরানো মরচে পড়া বড় একটা কাঁচি দেখে বের করে নিল সেটা। রবিনের পাশে গিয়ে বসল চাড় মেরে ট্র্যাপ-ডোরটা তুলতে ওকে সাহায্য করার জন্যে।

নড়ে উঠল ডোরটা। চাপ বহাল রেখে বলল কিশোর, 'উঠে যাবে। চাপ ছেড়ো না। আরও জোরে।'

ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কব্জা। বিচিত্র শব্দে গোঙাল পাল্লাটা হঠাৎ ওপরে উঠে গেল। চিত হয়ে পড়ে গেল কিশোর।

হেসে উঠল মুসা।

কিশোরও হাসল। উঠে বসে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল।

রবিন কাশছে। গর্তের চারপাশে জমে থাকা ধুলো উড়ছে। নাকে ঢুকে গেছে তার।

দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখল কিশোর, কেউ আসছে কিনা। প্রচুর হই-চই হচ্ছে। হট্টগোল কানে গেলে দেখতে আসতে পারে।

গর্তের ভেতরে উঁকি দিল মুসা। বদ্ধ বাতাসের ভাপসা গন্ধ লাগল নাকে।

'কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না,' বলল সে। 'টর্চ আছে?'

'দিনের বেলা, তাই টর্চ আনার কথা ভাবিইনি,' জবাব দিল কিশোর।

'ছাউনিটাতে আছে কিনা দেখে আসি,' বলে উঠে চলে গেল রবিন ফিরে এসে জানাল, 'টর্চ নেই, তবে ম্যাচ পেয়েছি। এই যে।'

বাক্সটা হাতে নিয়ে ঝাঁকি দিল কিশোর। ভরা নয়, অল্প কয়েকটা কাঠি। খস করে একটা কাঠি জ্বেলে জ্বলন্ত কাঠি সহ হাতটা নামিয়ে দিল নিচে।

ইঁটের তৈরি একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাপটা মেরে নিভিয়ে দিল আগুনটা। দুই সহকারীর দিকে ফিরল সে। 'সিঁড়ি আছে যখন, নামা যায়, কি বলো?'

ভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেল মুসা। রবিন তো আগেই রাজি।

সাবধানে খাড়া সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কাঠি মাত্র কয়েকটা, নিতান্ত প্রয়োজনের সময় ছাড়া জ্বালবে না ভেবে অন্ধকারেই অনুমানে নির্ভর করে নামছে কিশোর। পা ফসকাল মুসা। পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলাল। গোড়ালি মচকে ফেলেছিল আরেকটু হলেই।

'আরে কি করছ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর

'সরি!' বিড়বিড় করল মুসা। 'আই কিশোর, আরেকটা কাঠি জ্বালো না। মনে তো হচ্ছে কবরের মধ্যে ঢুকেছি, বাপরে বাপ, যা অন্ধকার! কি জায়গারে এটা!'

'কি আর? এখানে দিনদুপুরেও ভ্যাম্পায়ারেরা ঘোরাফেরা করে,' ফিসফিস

করে বলল রবিন, ভয় পাওয়ার ভান করছে। 'আরেকটু সামনে এগোলেই হয়তো হোঁচট খাব ড্রাকুলার কফিনে...'

'দোহাই তোমার, রবিন, তেনাদের নিয়ে হেলাফেলা কোরো না...!' কেঁপে উঠল মুসার গলা।

আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। নিচু ছাত। সাদা রঙ করা দেয়ালের বহু জায়গায় প্লাস্টার খসে গেছে, ছাতলা পড়া। আরেক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল। গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। আগুন দেখে জাল বেয়ে তাড়াহুড়া করে সরে যেতে লাগল একটা মাকড়সা। আলোটা নিভে যাওয়ার আগের মুহূর্তে চোখে পড়ল ওদের, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা ওয়াইন র‍্যাক, আরেক দিকে সম্ভবত কয়লার স্তূপ। সিঁড়িও আছে আরেকটা।

'এটাই বোধহয় সেই সেলার,' মুসা বলল, 'মিস্টার সেভারন যেটার কথা বলেছিলেন।'

'আমি যে পুরানো প্ল্যানটা কপি করে এনেছি,' রবিন বলল, 'তাতেও আছে এটা।'

আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, 'জায়গাটা যেন কেমন। গা ছমছম করে, তাই না?'

'তুমিও বলছ এ কথা!' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা। 'দেখা তো হলো? চলো, যাইগে...'

'আস্তে!' থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। 'কথা বলে কারা?'

মাথার ওপর থেকে আসছে চাপা কথার শব্দ।

'মিস্টার সেভারন নাকি?' বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'নিজেরা দুজন ছাড়াও আরও কেউ আছে,' রবিন বলল। 'কে?'

'মিসেস ড্রাকুলা চলে আসেনি তো সাতসকালে উঠে?' মুসার প্রশ্ন।

দম বন্ধ করে, কান পেতে শুনতে লাগল তিনজনে। পাথরের মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার শব্দ শুনে বুঝল রান্নাঘরটা ওদের ওপরে কোথাও রয়েছে। কথা শোনা যাচ্ছে ওঘর থেকেই।

'আরেকটা সিঁড়ি যে দেখলাম, সেটা দিয়ে উঠে দেখা যেতে পারে কোথায় উঠলাম,' প্রস্তাব দিল কিশোর।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সেটা বরং ভাল,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তর সইছে না মুসার। আগে আগে উঠতে শুরু করল সে। তার পেছনে থেকে কাঠি জ্বেলে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে রাখল কিশোর। সবার পেছনে রবিন।

সিঁড়ির মাথায় উঠে আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। ট্র্যাপ-ডোর দেখা গেল এখানেও।

'এটা কি?' ডোরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা একটা জিনিস ধরে টান দিল রবিন। বের করে আনল।

কাঠির আলোয় দেখতে দেখতে বলল কিশোর, 'কাপড়। পোশাক থেকে

ছিঁড়ে গেছে। দেখো, কি রকম পাতলা, ফিনফিনে…'

শিউরে উঠল মুসা, 'খাইছে! তারমানে মিসেস সেভারন ভুল দেখেননি, সত্যি সত্যি ভূত আছে…'

'ফালতু কথা বাদ দিয়ে ঠেলা দাও,' কিশোর বলল।

আরও দুই ধাপ উঠে ঘাড় বাঁকা করে, কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল মুসা। নড়াতে পারল না পাল্লাটা। তাকে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর। ফাঁক হতে শুরু করল পাল্লা। ঠিক এই সময় পা ফসকাল রবিনের। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে তাকে ধরে তুলল মুসা। 'ব্যথা পেয়েছ?'

'সিঁড়ি থেকে পড়লে ব্যথা আর না পায় কে!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'তবে তেমন কিছু না।'

'এই, দেখে যাও,' ফিসফিস করে ডাকল কিশোর। 'জলদি এসো!'

ডালা আরও ফাঁক করে ফেলেছে সে। সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে লাল রঙের একটা জিনিস।

'কার্পেটের কিনারটা না?' দেখে বলল রবিন। 'ভূতের ঘরের নিচে রয়েছি আমরা, কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে জোয়ালিনের প্রেমিক চুরি করে এখান দিয়েই ঢুকত,' মুসা বলল।

'হয়তো,' কিশোর বলল। 'পুরানো বাড়িটা তখন ছিল এখানে। সেলার থেকে সরাসরি এদিক দিয়েই ডাইনিং রুমে মদ নিয়ে যেত চাকর-বাকরেরা।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'সামার-হাউসের ভেতর দিয়ে এসে চোরও ঢুকেছিল সেদিন এপথেই।'

দুই ধাপ নেমে এসে ডালাটা ছেড়ে দিল কিশোর। 'কিন্তু এটা যে আছে এখানে, জানল কি করে সে? জানার তো কথা নয়। সব সময় কার্পেটে ঢাকা থাকে।'

'নিশ্চয় পুরানো প্ল্যানটা থেকে। আমি যেটা কপি করে এনেছি। শাজিনের তো জানাই আছে। যে লোকটাকে পাঠিয়েছে নকশা দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে কোনখান দিয়ে ঢুকতে হবে…'

'আর সেজন্যেই,' কিশোর বলল, 'কার্পেটটা অমন অগোছাল হয়ে ছিল। মিসেস সেভারন জানতেন পেরেক দিয়ে আটকানো ছিল…ঠিকই জানতেন; তাঁর তো আর জানার কথা নয়, তথাকথিত ভূতটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে নিচ থেকে ঠেলে ট্র্যাপ-ডোর খুলেছে, ওপরে বিছানো কার্পেটটাও পেরেক থেকে ছুটে গেছে ঠেলা লেগে।'

'চমৎকার! ভূত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। চলো, সেভারনদের জানাইগে।'

'এদিক দিয়েই যাব?'

'দরকার কি ঠেলাঠেলি করার।'

সামার-হাউস দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। উজ্জ্বল রোদে চোখ

ধাঁধিয়ে গেল।

বাড়ির পাশ ঘুরে আসার আগেই একটা গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ হলো। স্টার্ট নিল এঞ্জিন। দৌড় দিল কিশোর। বাড়ির সামনের দিকটায় পৌঁছে দেখল মিস্টার সেভারনের গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে।

'কার সঙ্গে গেলেন?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। গাল চুলকাল, 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না···এমন কে এল, সাতসকালে বের করে নিয়ে যেতে পারল তাঁকে? গাড়িটাও নিশ্চয় ড্রাইভ করছে ওই লোকই।'

'আচ্ছা···' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'কি বলতে চাও?'

'মিসেস ড্রাকুলা লোক পাঠিয়ে কিডন্যাপ করাল না তো?'

'তা কি করে হয়···' বলতে গেল মুসা।

কিন্তু সচকিত হয়ে উঠেছে কিশোর 'জলদি এসো! মিসেস সেভারনের কি অবস্থা করেছে কে জানে!'

জোরে জোরে সামনের দরজা ধাক্কাতে শুরু করল কিশোর।

তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল দরজাটা

মিসেস সেভারনও অবাক, 'তোমরা! এই সাতসকালে তোমরা কোত্থেকে?'

'অনেক আগেই এসেছি আমরা,' জবাব দিল কিশোর 'কিন্তু আপনার স্বামী কোথায় গেলেন?'

অস্বস্তি দেখা দিল মিসেস সেভারনের চোখে। 'গেছে···!' দুধের বোতলগুলো তুলে নিলেন তিনি। 'এসো, ভেতরে এসো। তোমাদের এই ছিরি কেন? নর্দমায় নেমেছিলে নাকি?'

'নর্দমায় না, সেলারে।' রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। কার সঙ্গে গেলেন মিস্টার সেভারন? মিসেস সেভারন বলতে চাইছেন না কেন? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিডন্যাপ করা হয়নি সেভারনকে।

আবার মিসেস সেভারনের দিকে ঘুরল সে। 'কাল রাতে ফোন করার অনেক চেষ্টা করেছি। নষ্ট নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস সেভারন। 'হ্যাঁ। আজ ঠিক করে দেবে বলেছে।'

*

সামার-হাউস দিয়ে ঢুকে কি পাওয়া গেছে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মিসেস সেভারন। বললেন, 'কিছুই জানতাম না আমরা। জানবই বা কি করে? কার্পেটটা কি কখনও তুলেছি।'

'এ বাড়ির পুরানো প্ল্যানটাও দেখেননি?'

'না। এ সব কাজ জ্যাকিই করত।'

'কিন্তু আসল দলিলগুলো নিশ্চয় আছে আপনাদের কাছে। সেদিন সেই লোকটা ওগুলোই নিতে এসেছিল।'

'বোধহয় আছে অনেক পুরানো কিছু দলিল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখেছি জ্যাকিকে। বলত, এখানকার পুরানো ইতিহাস জানার চেষ্টা করছে। তবে সবই···সবই···ওই ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষটা এসে জ্বালানো শুরু করার আগে।'

বার বার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর। বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকে বলল, 'আপনি সত্যি বলছেন মিসেস সেভারন, আপনার স্বামী কোন বিপদে পড়েননি?'

লম্বা করে শ্বাস টানলেন মিসেস সেভারন এবারেও জবাব দিলেন না কিশোরের প্রশ্নের। 'বড় চিন্তা হচ্ছে···হুট করে এভাবে চলে গেল···আবার না কোন বিপদে জড়ায়···'

'কোথায় গেলেন?'

'মেয়েলোকটার অফিসে···' বলেই চুপ হয়ে গেলেন মিসেস সেভারন। 'নাহ্···তোমাদের এ ভাবে বলে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না···'

'মিসেস শাজিনের অফিসে! কেন?'

'বিরক্তর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কত আর সহ্য করবে। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না বলেছে, দরকার হয় পুলিশের কাছেই যাবে। ওরা বিশ্বাস করবে না বলেই এতদিন যায়নি।···সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে ওই শয়তান বেটিটার অত্যাচার।'

রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন মিসেস সেভারন 'ওদের যেতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।···পুলিশ আগেও বিশ্বাস করেনি আমাদের কথা, এখনও করবে না। শুধু শুধু আমাদের ছেলেটাকে···' কান্নায় বুজে এল তাঁর কণ্ঠ।

'ওদের মানে? আর কে আছেন মিস্টার সেভারনের সঙ্গে?'

কিছুক্ষণ থেকেই ভারী একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছিল। জোরাল হলো সেটা। উঠে দেখতে গেল মুসা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, জলদি এসো!'

দৌড়ে গেল রবিন। কিশোর গেল তার পেছনে।

গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটা দৈত্যাকার জেসিবি ডিগার। ইচ্ছে করে ইঞ্জিনটাকে প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ করাচ্ছে ড্রাইভার। এগজস্ট দিয়ে ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। নীরব রাস্তাটার নীরবতা ভেঙে চুরমার করার বিকৃত আনন্দে মেতেছে যেন।

বার কয়েক গোঁ-গোঁ করিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন কমাল ড্রাইভার। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। ঠিকানা ঠিক আছে কিনা দেখল বোধহয় তারপর পিছাতে শুরু করল বিশাল যন্ত্রটাকে। কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে নাক ঘুরাল কটেজের দিকে। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'উদ্দেশ্যটা কি ওর?' বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'দেখছ না, ভাঙতে আসছে! গেট, বেড়া সব ভেঙে ঢুকে পড়বে বাগানে...'

'ঠেকানো দরকার ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। সচল হলো হঠাৎ। দরজার দিকে দৌড় দিল।

তেরো

কামানের গোলার মত সামনের দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোল যেন তিন গোয়েন্দা। হাত নাড়তে নাড়তে গেটের দিকে ছুটল।

'এই, থামুন, থামুন!'

কিন্তু ওদের চিৎকার কানেই গেল না যেন ড্রাইভারের।

সামনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস সেভারন। মুখে হাতচাপা দিয়েছেন। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছেন দানবটার দিকে। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট চিৎকার। বুড়ো পা দুটো যেন আর ধরে রাখতে পারল না শরীরটাকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে গেলেন দরজার গোড়ায়।

দৌড়ে ফিরে গেল তিন গোয়েন্দা। হাত ধরে টেনে সরাল তাঁকে। দরজার ফ্রেমে পিঠ লাগিয়ে যতটা সম্ভব আরাম করে বসিয়ে দিল।

'মিসেস সেভারন, কি হয়েছে আপনার?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রবিন।

ঘন ঘন কয়েকবার ভারী দম নিলেন মিসেস সেভারন। 'না না, আমার কিছু হয়নি।'

'শোবেন নাকি? নিয়ে যাব ভেতরে?'

'না, আমি এখানেই থাকব।'

ওদিকে প্রচণ্ড গর্জন তুলে বেড়ার কাছে চলে এসেছে ডিগারটা। বেড়া ভাঙতে প্রস্তুত।

'সত্যি সত্যি ভাঙবে!' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'পাগল হয়ে গেছে! না হুমকি দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?'

'ও শয়তান মহিলাটার লোক হয়ে থাকলে,' কিশোর বলল, 'সত্যিই ভাঙবে।'

হাত নাড়তে নাড়তে আবার ছুটল সে। ড্রাইভারের চোখে পড়ল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এল লোকটা। চিৎকার করে বলল, 'কি ব্যাপার? চাপা পড়ে মরার ইচ্ছে হলো নাকি?'

জবাব না দিয়ে রাগত স্বরে প্রশ্ন করল কিশোর, 'আপনি কি করছেন?'

'দেখে বুঝতে পারছ না?' মাথার হলুদ সেফটি হেলমেটটা ঠেলে পেছনে সরাল ড্রাইভার।

'বুঝতে তো যা পারছি, বাগানটার সর্বনাশ করার ইচ্ছে হয়েছে আপনার।'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

ওদের দিকে একবার করে তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে নজর ফেরাল লোকটা, 'বুঝলেই ভাল।' ঘুরে আবার ক্যাবে উঠতে গেল।

দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'কে করতে বলেছে আপনাকে?'

'যে-ই হোক, বলেছে। অর্ডার।'

'কে দিয়েছে, সেটাই তো জানতে চাইছি।'

ওভারঅলের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল লোকটা। 'লোকাল কাউন্সিল।'

'দেখি তো?' কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিল কিশোর।

মুসা আর রবিনও দেখার জন্যে পাশে সরে এল।

কাগজটা রাস্তা বাড়ানোর পার্মিট। রাস্তা চওড়া করার অনুমতি রয়েছে তাতে।

'এ কথা তো নতুন শুনলাম,' মুসা বলল লোকটার দিকে তাকিয়ে। 'যাঁদের বাড়ি তাঁদের আগে জানানো হয়নি কেন?'

'জানাবে কি করে?' ব্যঙ্গ করে বলল কিশোর। 'ভুয়া কাণ্ড তো! সেই ড্রাকুলা বেটির কাজ; দেখছ না, ভাঙা টাইপরাইটার, "ও" অক্ষরটা ক্যাপিটাল্ লেটারে।'

'তাই তো!'

'এ সব ধাপ্পাবাজি ছাড়ুন!' কাগজটা লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'বিদেয় হোন এখান থেকে!'

'তাই নাকি?' রাগল না লোকটা। 'কার হুকুমে?'

'হুকুমের কথা বলা হচ্ছে না। কাউন্সিলের বাপেরও সাধ্য নেই জায়গার মালিকের সঙ্গে কথা না বলে, তার অনুমতি না নিয়ে রাস্তা বাড়ানোর হুকুম দেয়।'

'ওসব আমার জানার দরকার নেই। আমাকে লিখিত অর্ডার দিয়েছে, পালন করতে আমি বাধ্য। তোমার মত একটা ছেলেমানুষের কথায় ফিরে যাব আমি ভাবলে কি করে?'

'ছেলেমানুষ কাকে বলছেন!' রেগে উঠল মুসা।

হাত তুলে তাকে থামার ইঙ্গিত করে কিছুটা নরম হয়ে বলল কিশোর, 'ব্যাপারটা যে ধাপ্পাবাজি, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। যদি একটু সময় দেন।'

পকেটে কাগজটা রেখে মাথা নাড়ল ড্রাইভার, 'সরি। আমার কাজ আমাকে করতেই হবে। এদিকের বেড়া আর গাছগুলোর আশা ছাড়ো,' ক্যাবে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সামনের দিকে একটা লিভার ঠেলে দিতেই বেড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

'কিশোর, ওকে থামানো দরকার!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুদিক থেকে দুজনের হাত চেপে ধরল রবিন। 'এসো, সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, আমাদের মাড়িয়ে বেড়া ভাঙতে আসে কি করে।'

গেটের বাইরে এসে বেড়ার সামনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গেল ওরা।

পাশে ঝুঁকে মাথা বের করল ড্রাইভার, 'কি হলো, সরো!' আরেকটা লিভার ঠেলে দিল সে। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ডিগার।

'খাইছে!' ঢোক গিলল মুসা। 'সত্যি সত্যি চাপা দেবে নাকি?'

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নাড়ল কিশোর, 'এত সাহস হবে না।'

দেখতে দেখতে যন্ত্রটা এত কাছে চলে এল, ওটার বনেটের মরচেগুলোও দেখতে পাচ্ছে ওরা। চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না। হাতের চাপ বাড়াল দুই বন্ধুর হাতে। ওরাও চাপ দিল একাত্মতা ঘোষণা করে।

বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আচমকা নীরবতা নেমে এল রাস্তা জুড়ে। চোখ মেলে দেখল কিশোর, ক্যাব থেকে নেমে আসছে ড্রাইভার। চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'সরো!' রবিনের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরানোর চেষ্টা করল সে। 'মরতে চাও নাকি?'

'দেখুন,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর, 'আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি। নইলে কি আর এভাবে মেশিনের সামনে দাঁড়াতাম আমরা? আমাদের প্রাণের ভয় নেই?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

ইতিমধ্যে হই-হট্টগোল শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে সেভারনদের পড়শীরা।

শোনার পর একজন বলল, 'ঠিকই তো বলছে ছেলেগুলো। আপনি জোর করে ভাঙতে এসেছেন কেন? কে হুকুম দিল আপনাকে?'

দ্বিধায় পড়ে গেছে ড্রাইভার। বলল, 'কাউন্সিল। আমার বস্ ডেকে বলল, ওপর থেকে ভাঙার নির্দেশ এসেছে আমাকে পাঠাল ভাঙতে।'

'ভাঙতে বললে ভাঙুন, আমরা তো মানা করছি না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু বলছি একটু সময় দিতে, যাতে আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি আপনারা ভুল করছেন।'

হাতঘড়ি দেখল ড্রাইভার। 'আমি পারব না। এখান থেকে সেরে গিয়ে আরেকটা কাজ করতে হবে। সময় নেই।'

'তাহলে ওখানের কাজটাই আগে সেরে আসুন না?'

মাথা নাড়ল লোকটা, 'সরি। এটাই আগে করার হুকুম দিয়েছে।'

'প্লীজ!' অনুরোধ করল রবিন, 'আধঘণ্টা সময় দিন। তাতেই হয়ে যাবে।'

হেলমেটটা খুলে মাথা চুলকাল ড্রাইভার। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। 'বেশ, দিলাম আধঘণ্টা, যাও। ততক্ষণে চা-নাস্তা খেয়ে নিই আমি। সকালে খবরের কাগজটাতেও চোখ বোলানো হয়নি। মনে থাকে যেন, আধঘণ্টা। তারপর আর সময় পাবে না...'

আবার ক্যাবে উঠে গেল সে। লাঞ্চবক্স আর ফ্লাস্ক বের করল।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। দুই সহকারীকে আসতে বলে

ছুটল।

দরজার সামনেই বসে আছেন মিসেস সেভারন। ফ্যাকাসে চেহারা। গায়ের কাঁপুনি যায়নি।

'কি বলল ও?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওরা নাকি রাস্তা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে,' কিশোর বলল, 'আপনাদের বাগানের সামনের অংশটা যাবে।'

ঝট করে হাত উঠে গেল মিসেস সেভারনের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে।

'ভাববেন না,' তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর, 'আমরা জানি, এগুলো সব অগাস্ট শাজিনের শয়তানি। প্রমাণ জোগাড় করতে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু...'

'পরে বলব সব, এখন সময় নেই। আপনাকে শুধু বলে যাচ্ছি, চিন্তা করবেন না। এই, এসো তোমরা।'

সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। সাঁ সাঁ করে ছুটল। আধঘণ্টা সময়ও নেই হাতে। এর মধ্যে ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটে শাজিনের অফিসে যেতে হবে, প্রমাণ জোগাড় করে ফিরতে হবে আবার ম্যানিলা রোডে। অসম্ভব মনে হচ্ছে।

কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ খেয়াল করল কিশোর, রবিন নেই ওদের সঙ্গে। ফিরে চেয়ে দেখল অনেক পেছনে পড়েছে সে। তাড়াতাড়ি আসার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করে আবার সামনে তাকাল কিশোর।

'পারব না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা, 'কোনমতেই পারব না এই সময়ের মধ্যে।'

ফুস্ করে শব্দ হলো। কেঁপে উঠল মুসার হাত। হ্যান্ডেলটা বেয়াড়াপনা শুরু করল। সামনের চাকাটা রাস্তা থেকে নেমে গেল পথের পাশে। সামলাতে পারল না মুসা। উল্টে পড়ে গেল।

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

লাফ দিয়ে নেমে মুসার দিকে দৌড় দিল কিশোর, 'মুসা! কি হলো তোমার? ব্যথা পেয়েছ?'

কনুই ডলল মুসা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে তুলল সাইকেলটা। সামনের চাকাটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল এমন করে যেন নিমফল মুখে দিয়েছে, 'গেছে!'

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'পাংচার।'

ঘড়ি দেখল রবিন, 'করবটা কি এখন?'

'তোমরা চলে যাও,' মুসা বলল। 'আমি ফিরে গিয়ে মিসেস সেভারনকে পাহারা দিই।...যাও যাও, দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট কোরো না।' দুজনকে ঠেলা দিল সে। 'নাকি তোমাদের একজন থাকবে, আমি যাব?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, তুমিই থাকো। আমরা যাই।'

আবার সাইকেলে চাপল দুজনে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, 'আমাদের দেরি হলে লোকটাকে ঠেকাবে, যে ভাবে পারো।'

দুজনকে চলে যেতে দেখল মুসা। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। চাকা বসে যাওয়া সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে চলল কটেজের দিকে।

*

তীব্র গতিতে প্যাডাল করে চলেছে কিশোর আর রবিন। বেপরোয়া। রাস্তার মোড়গুলোতেও গতি কমাচ্ছে না, জোড়গুলোতেও না। রেলওয়ে ক্রসিঙের দিকে চলেছে এখন।

গেটের দিকে এগোতে এগোতে দমে গেল। লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে। ওয়ার্নিং বেল বাজছে। দূরে শোনা গেল ট্রেনের হুইসেল। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল গেটটা।

'বন্ধ হওয়ার আগে পেরোতে পারব?' রবিনের প্রশ্ন।

'না,' ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমরা ট্রেনে কাটা পড়ে মরলে কোন উপকার হবে না সেভারনদের।'

ট্রেনটা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল দুজনে। অস্থির হয়ে বার বার ঘড়ি দেখছে রবিন।

'কয়েক যুগ তো পার হয়ে গেল,' গজগজ করতে লাগল সে, 'ট্রেন আসারও আর সময় পেল না! মুসা ঠিকই বলেছে, আধঘণ্টার মধ্যে কোনমতেই ফিরতে পারব না আমরা।'

'পারতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'না পারলে চলবে না!'

কানফাটা শব্দ তুলে পার হয়ে গেল ট্রেন। খুলে যেতে শুরু করল গেট। প্যাডালে চাপ দিল ওরা। লাইন পেরিয়ে আসতেই পেছন থেকে শোনা গেল গাড়ির হর্ন। সামান্য ভাঙা ভাঙা। পরিচিত মনে হলো কিশোরের। ফিরে তাকাতেই দুলে উঠল বুক। ইয়ার্ডের পিকআপটা। গাড়ি চালাচ্ছেন রাশেদ পাশা। পাশে বসে আছে ডন।

হাত তুলল কিশোর।

আগেই দেখতে পেয়েছেন রাশেদ পাশা। রাস্তার পাশে থামালেন।

পিকআপের পেছনে মুসাকে দেখে অবাক হলো কিশোর। কিন্তু প্রশ্ন করার সময় নেই এখন। গাড়ি থামতেই পাশে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা, 'সাইকেলগুলো দাও, তুলে ফেলি।'

সাইকেল দুটো তুলে রবিন আর কিশোরের উঠে বসতে মিনিটখানেকও লাগল না। পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল কিশোর, 'চাচা, যাও। ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটের মাথায় আমাদের নামিয়ে দিলেই চলবে।'

গাড়ি চলল। মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি চাচাকে পেলে কোথায়?'

'কাকতালীয় ঘটনা প্রচুর ঘটে পৃথিবীতে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'চাকা ফুটো হওয়াতে হাজারটা গাল দিয়েছি সাইকেলটাকে। ঠেলে নিয়ে প্রায় পৌঁছে গেছি সেভারনদের বাড়ির

গেটে, এই সময় পাশের আরেকটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে পেছন থেকে আমার পাশে এসে দাঁড়াল পিকআপটা। ডন আমাকে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে দেখে রাশেদ আঙ্কেলকে বলেছে। আমার সাহায্য লাগতে পারে ভেবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তোমরা কোথায় গেছ তাঁকে জানালাম। ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটে দিয়ে আসতে অনুরোধ করলাম।'

'হুঁ, একেই বলে ভাগ্য,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ম্যানিলা রোডের এক বাড়িতে মালের দরদাম করতে যাওয়ার কথা ছিল চাচার। তোমার চাকাটা ফুটো হলো বলেই দেখাটা হলো, নইলে এখন গাড়িটা পেতাম না।'

'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে...' কিশোরের কাছ থেকে শেখা বাংলা কবিতাটা এই সুযোগে ঝেড়ে দিল রবিন।

যে ঝরঝরে পিকআপটা নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ আর হাসাহাসি কিশোরও করে, চাচাকে মিউজিয়ামে দিয়ে আসতে বলে, সেটাই এখন বিরাট উপকার করল। সাইকেলের চেয়ে অনেক দ্রুত পৌঁছে দিল ওল্ড স্ট্রীটের মাথায়।

চিৎকার করে চাচাকে বলল কিশোর, 'রাখো এখানেই।'

তিন গোয়েন্দা নেমে গেলে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, 'দাঁড়াব এখানে?'

'না, লাগবে না,' কিশোর বলল, 'চলে যাও। সাইকেলগুলো নিয়ে যাও।' মিস্টার সেভারনকে পেলে তাঁর গাড়িতেই ফিরতে পারবে ম্যানিলা রোডে। সাইকেলগুলো রাখলে ঝামেলা হবে তখন, তাই দিয়ে দিল।

'নতুন কোন কেস নাকি তোদের?'

'হ্যাঁ। পরে বলব সব। যদি সফল হতে পারি কাগজেও দেখতে পাবে।'

ডন নামতে চাইল। নামতে দিলেন না রাশেদ পাশা। মুখটাকে পেঁচা বানিয়ে বসে রইল সে। কিশোর ওর দিকে তাকাতেই জিভ বের করে ভেঙচি কাটল। হেসে ফেলল কিশোর। মুসা আর রবিনও হাসতে লাগল।

পিকআপটা চলতে শুরু করার আগেই রওনা হয়ে গেল তিনজনে। ঢুকে পড়ল কানাপলিটায়, যেটাতে রয়েছে শাজিন-হ্যারিসনের অফিস।

পুরানো বিল্ডিংটার সামনে সেভারনদের সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

থামল কিশোর। বলল, 'গাড়িটা আছে, তারমানে মিস্টার সেভারন এখনও শাজিনের অফিসেই রয়েছেন।'

'কি করে জানলে?' মুসার প্রশ্ন।

'তা ছাড়া আর কোথায় থাকবেন? চলো, ঢুকে পড়ি।'

কিন্তু ঢুকতে গিয়ে হতাশ হতে হলো। বিল্ডিঙে ঢোকার মূল দরজাটা বন্ধ। ঠেলা দিয়ে দেখল রবিন। নব ধরে মোচড় দিল। ভেতর থেকে তালা লাগানো।

'তালা দেয়া!' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'কি করা যায়?'

'আর কোন পথ নেই?'

'না। কিন্তু মিস্টার সেভারন ঢুকলেন কিভাবে?'

'কি করে বলব?' পাল্লায় কাঁধ লাগিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল কিশোর।

হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, 'নাহ্, খোলা যাবে না। শনিবারে কি কেউ কাজ করে না নাকি এখানে?' রবিনের দিকে তাকাল আবার সে, 'ঢোকার আর কোন পথই কি নেই?'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন, 'আছে, তবে দস্যু সাইমন টেম্পলার হওয়া লাগবে আমাদের।'

'মানে?'

'একটা ফায়ার এসকেপ আছে। ওটা বেয়ে উঠতে পারলে…'

রবিনকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা। 'দেখাও ওটা, সাইমন টেম্পলারই হব আজ। কোনদিকে?'

বাড়ির পাশ দিয়ে দৌড় দিল রবিন। পেছনে চলল মুসা আর কিশোর।

ফায়ার এসকেপটার নিচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। চিন্তিত। বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু ওটা বেয়ে ওঠা…সত্যি সত্যি সাইমন টেম্পলারকে দরকার…আমরা কি পারব!'

'তোমাদের দুজনের পারা লাগবে না,' নির্দ্বিধায় বলে দিল মুসা, 'আমি উঠে যাচ্ছি। জানালা দিয়ে ঢুকে নেমে এসে সামনের দরজা খুলে দেব।…রবিন, বলো তো, কোন কোন দিক দিয়ে গিয়ে কিভাবে আসতে হবে?'

নড়বড়ে, মরচে পড়া লোহার ধাপগুলো বেয়ে উঠে যেতে লাগল মুসা। কোনভাবে যদি পা পিছলায়, কিংবা কোন একটা ধাপ খসে যায়, নিচে পড়ে যে ছাতু হয়ে যেতে হবে জানে, সেজন্যেই ভয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।

'সাবধান, মুসা!' ধাপগুলোর গোঙানি আর কচমচ শব্দ বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে যেন কিশোরের। 'অসুবিধে হলে নেমে এসো, অন্য উপায় বের করব।'

কিন্তু জানালার কাছাকাছি চলে গেছে ততক্ষণে মুসা। পাশে হাত বাড়িয়ে একটা জানালার চৌকাঠের নিচটা ধরে ফেলল। ঝুলে পড়ল একহাতের ওপর। দ্বিতীয় হাতটাও বাড়িয়ে দিয়ে ধরে ফেলল। নিজেকে টেনে তুলল চৌকাঠের ওপর। ঢুকে গেল ভেতরে। গলা বের করে নিচের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত নেড়ে সামনের দরজার কাছে চলে যেতে ইশারা করল কিশোর আর রবিনকে।

ঠিক দেড় মিনিটের মাথায় দরজাটা খুলে দিল মুসা।

ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর আর রবিন।

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল তিনজনে। তিনতলায় শাজিন-হ্যারিসনের অফিসের সামনে আসতে কথা শোনা গেল ভেতর থেকে। চাপা স্বরে কথা বলছে দুজন লোক।

'মিস্টার সেভারনের গলা মনে হচ্ছে না?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'তাই তো,' মুসা বলল।

'শিওর হওয়ার একটাই উপায়,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'ভেতরে ঢুকে পড়া।'

*

অবাক হয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন আর তাঁর সঙ্গী।

'তোমরা!…তোমরা এখানে!' মিস্টার সেভারন বললেন।

জবাব না দিয়ে কিশোর তাকিয়ে আছে তাঁর সঙ্গীর দিকে।

'আপনি জ্যাকি না?' কিশোর বলল। 'কি করে এলেন?'

হাসল জ্যাকুয়েল সেভারন যার ডাকনাম জ্যাকি। 'তাহলে তোমরাই আমাকে চিঠি লিখেছিলে।'

'কিন্তু এখানে এলেন...' আবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর।

মাথা নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল জ্যাকি, 'সব বলার সময় নেই। একটা কথাই বলি, তোমাদের চিঠি পেয়ে মনে হলো এখানে কি ঘটছে দেখে যাওয়া দরকার।' বাবার দিকে ফিরল সে, 'বাবা, তোমাকে বলিনি, ওরা আমাকে শাজিনের শয়তানির কথা চিঠি লিখে জানিয়েছে।'

'ও, বাড়ি আসার তোর এটাই আসল কারণ। আমি তো ভেবেছি প্যারোলে ছাড়া পেয়ে আমাদের দেখতেই এসেছিস,' বাবার কণ্ঠে মৃদু অভিমান।

'দুটো কাজই করতে এসেছি,' হাসল ছেলে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই। আজকেই সন্ধ্যার আগে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।'

'আপনারা ঢুকলেন কি করে এখানে?' জানতে চাইল মুসা। 'সামনের দরজায় তো তালা লাগানো ছিল।'

আবার হাসল জ্যাকি। 'এখানে চাকরি করতাম যে ভুলে গেলে? ডুপ্লিকেট একটা চাবি এখনও আছে আমার কাছে।'

'কিন্তু তোমরা এখানে কেন?' আবার সেই প্রথম প্রশ্নটাই করলেন মিস্টার সেভারন। 'ঢুকলেই বা কি করে? আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি? জ্যাকির মা ভাল আছে? কিছু ঘটেছে?'

কি ঘটেছে, জানাল কিশোর।

রক্ত সরে গেল বৃদ্ধের মুখ থেকে। ডেস্কের কিনার খামচে ধরলেন তিনি। 'এখনি যাওয়া দরকার!'

'যেতে তো হবেই, তার আগে কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে নিই। "ও" অক্ষর নষ্ট হওয়া ওই টাইপরাইটার দিয়ে একটা চিঠিও লিখতে হবে, ড্রাইভারকে বোঝানোর জন্যে যে সে একটা মস্ত ভুল করতে যাচ্ছে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে।'

'এখনও দশ মিনিট আছে!' বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। 'আমার তো মনে হচ্ছে দশ হাজার বছর পার করে দিয়েছি! তবে সময় নিয়ে ভাবছি না,' হেসে পকেটে হাত ঢোকাল সে। একটা চাবি বের করে দেখিয়ে বলল, 'ডিগারের ইগনিশন কী। চুরি করেছি।'

'ও, এ জন্যেই পেছনে পড়ে গিয়েছিলে তখন,' হাসি ফুটল কিশোরের মুখেও। 'খবর লুকিয়ে রাখার দেখি তুমিও ওস্তাদ। যাকগে, কাজের কাজই করেছ একটা।'

'ড্রাইভারকে যে নির্দেশটা দেয়া হয়েছে,' জ্যাকি বলল, 'তার একটা কপি নিশ্চয় এখানে আছে কোনখানে। যদিও অতটা অসাবধান ভাবতে পারছি না

শাজিনকে। ধরা পড়ার মত প্রমাণ রেখে কাজ করার বান্দা নয় ও। আমি আর বাবা এতক্ষণ ধরে স্টেটমেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।'

'স্টেটমেন্ট?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'হ্যাঁ, জমা-খরচের স্টেটমেন্ট। ইনকাম ট্যাক্স অফিসকে দিতে হয় যেটা। দেখতে চাইছিলাম, আমি যে সময় যে টাকাটা চুরি করেছি বলেছে শাজিন, সেই অঙ্কের টাকা সেই সময়ে অন্য কোন খাতে খরচ করেছে কিনা সে। ব্যাংক থেকে তখন কত টাকা তুলেছে, সেটা স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই প্রমাণ করে দেয়া যাবে সে-ই খরচ করেছে টাকাটা, আমি চুরি করিনি।'

'যদি সে সেই টাকার হিসেবটা স্টেটমেন্টে দেখিয়ে থাকে,তবে। অত কাঁচা কাজ করবে বলে মনে হয় না।'

'নিজের অ্যাকাউন্টের হিসেব রাখার জন্যে ব্যক্তিগত আরেকটা স্টেটমেন্ট বানাতে পারে, যাতে আসল হিসেবটা রাখবে।'

'তা পারে। কিন্তু সেটা কোথায়?'

'পাইনি। টাকা যে আমি চুরি করিনি, প্রমাণ করার আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'

'এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'শাজিন এসে যদি দেখে ফেলে আমাদের, সাংঘাতিক বিপদে পড়ব।'

'যা হয় হবে,' জ্যাকি বলল, 'আবার খুঁজব। ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ না নিয়ে আজ আমি বেরোচ্ছি না এখান থেকে।'

চোদ্দ

জ্যাকির কথামত প্রথমে ফাইলিং কেবিনেটগুলোতে খুঁজতে আরম্ভ করল ওরা।

'সেক্রেটারির মেশিনে টাইপ করা যে কাগজ পাও, সব দেখো,' কিশোর বলল। 'ভাঙা কী দিয়ে লেখা হয়েছে, এমন কোন না কোন চিঠি নিশ্চয় পাবে। নিয়ে নেবে সেটা, প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। তোমরা এদিকটায় দেখতে থাকো। আমি ওদিকটায় দেখছি।'

কয়েক মিনিট পর হাসিমুখে বেরিয়ে এল কিশোর। হাতে একটা শর্টহ্যান্ড নোটপ্যাড আর দুই তা কাগজ। দুমড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল নিশ্চয় ময়লা ফেলার ঝুড়িতে, তুলে চেপেচুপে সোজা করে নিয়েছে।

সেক্রেটারির টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিল সে। আলতো করে প্যাডের একজায়গায় দাগ দিয়ে রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে, রাস্তা চওড়া করার অর্ডারের খসড়া।' দুমড়ানো একটা কাগজ দেখিয়ে বলল, 'আর এটা টাইপ করা অর্ডারের কপি। ভুল হয়েছিল বলে ফেলে দিয়েছে। টাইপরাইটারটা দিয়ে টাইপ করে দেখেছি, "ও" অক্ষরটা কোনমতেই ছোট হাতের করা যায় না, কী-টা নষ্ট, মারলেই ক্যাপিটাল লেটারটা পড়ে...'

'এটা কি?' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। একটা ফাইলিং কেবিনেটের একেবারে পেছনে লুকানো সবুজ একটা ফাইল বের করে আনল সে। খুলল।

'অ্যাই, জ্যাকি, দেখে যান!' ডাক দিল সে। 'আপনার বাবাকে লেখা চিঠির কপি।...একটা নিউজপেপার কাটিংও আছে। আদালতে আপনার কেসের রিপোর্ট।'

'এগুলো রেখেছে কেন?' অবাক হলো রবিন।

'দেখি?' এগিয়ে এল জ্যাকি।

কিশোরও দেখার জন্যে মুসার পাশে এসে দাঁড়াল। রিপোর্টটা পড়ে বলল, 'পনেরোই অগাস্ট টাকাটা ফান্ড থেকে চুরি গেছে বলে লিখেছে কাগজওলারা।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,' মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'একটা ভুয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে জাল দলিল সই করার অপরাধে অভিযুক্ত করেছে আমাকে শাজিন। চেকটা লেখা হয়েছে দশ তারিখে। কেউ আমার সই জাল করে স্বাক্ষর দিয়েছে ওটাতে। কে, নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

'কিন্তু ওই তারিখে তো আপনি ছিলেন না এখানে।'

'জানি। আমি তখন গ্রীসে। কিন্তু কোন সাক্ষী নেই আমার, যে সেটা প্রমাণ করবে।'

'আছে,' কিশোরের কালো চোখের তারা উত্তেজনায় চকচক করছে।

ভ্রূকুটি করল জ্যাকি, 'কে?'

'আপনার ছবি...আপনাদের বাড়ির বসার ঘরের ম্যান্টলপীসে যেটা রাখা আছে।'

মাথা নাড়তে লাগল জ্যাকি, 'কি বলছ বুঝতে পারছি না। বসার ঘরে ঢুকি না অনেকদিন।'

'তুই জেলে যাবার পর ডাকে এসেছে ছবিটা,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'অ্যাথেনসে তোলা হয়েছে।'

'অ্যাথেনসে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'পারথেননের সামনে দাঁড়ানো।'

নাক-চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগল জ্যাকি, মনে করার চেষ্টা করছে। উজ্জ্বল হলো মুখ। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে; একটা আমেরিকান মেয়ে তুলে দিয়েছিল ছবিটা। বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলাম ওকে। ভাবিইনি ছবিটা পাঠাবে সে।'

'আর তাতে...' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের, 'ছবির নিচে তারিখটা ছাপা হয়ে গেছে, ১০ অগাস্ট। আপনি জানেন, কিছু কিছু ক্যামেরায় ছবি তোলার তারিখটা ছাপা হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি তো কোন তারিখ দেখলাম না,' মিস্টার সেভারন বললেন।

'আছে,' জবাবটা দিল এবার রবিন, 'ভালমত খেয়াল করেননি, তাই দেখেননি। আমি হাতে নিয়ে দেখছিলাম সেদিন, মাউন্ট থেকে পড়ে গেল; তুলে নিয়ে আবার বসানোর সময় দেখেছি একেবারে নিচে তারিখ ছাপা রয়েছে। কিশোরও জানে। তখন অবশ্য তারিখটা নিয়ে কোন কথা ভাবিনি আমরা। ছবিতে তারিখ ছাপা থাকতেই পারে, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'স্বাভাবিক ব্যাপারটাই কাজে লেগে গেল এখন,' কিশোর বলল। 'জোরাল, সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল।'

হাসি ফুটল জ্যাকির মুখে। রবিনের কাঁধ চাপড়ে দিতে দিতে বলল, 'ভাগ্যিস হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলে।'

'কিন্তু কথা হলো,' মুসা বলল, 'মিসেস শাজিন এভাবে ফাঁসাতে গেল কেন আপনাকে?'

'প্রথম কথা, আমার ওপর একটা আক্রোশ আছে তার একজন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলরকে ঘুষ সেধেছে সে, সেই লোক আবার আমার বন্ধু। কয়েকটা বিল্ডিঙের প্ল্যান পাস করে দিলে তাকে অনেক টাকা ঘুষ দেবে বলেছে।'

'পুলিশকে জানাল না কেন আপনার বন্ধু?'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকি। 'তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল শাজিন। অল্প বয়েসে একটা অপরাধ করে ফেলেছিল–তেমন কিছু না, তবু বন্ধুটির সেটা নিয়ে মাথাব্যথার অন্ত নেই। সেটা জেনে গিয়েছিল শাজিন; ওই কথা মনে করিয়ে দিয়ে, পুলিশকে বলে দেবার ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে। আমার বন্ধুটি জেলে যাবার ভয়ে শাজিনের কথা মানতে বাধ্য হয়েছে। বউ-বাচ্চা আছে তার...' রেগে গেল জ্যাকি। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'মহিলাটা এতই শয়তান, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না। আমি যখন জেনে ফেললাম এসব খবর, আমাকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে চাইল সে। আমি ঘুষ নিতে রাজি না হওয়াতে গেল খেপে। শেষে আমাকেই দিল ফাঁসিয়ে।'

'আস্তে,' সচকিত মনে হলো মিস্টার সেভারনকে, 'কে যেন আসছে!'

সবাই শুনতে পেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

'মিসেস শাজিন না তো!' তাড়াতাড়ি দুই সহকারীকে নির্দেশ দিল কিশোর, 'আই, পেছনের অফিসটায় লুকিয়ে পড়ো। আপনারাও আসুন।'

দ্রুত পেছনের অফিসটায় চলে এল সবাই। ফাইলিং কেবিনেটের আশেপাশে ঘাপটি মেরে রইল। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। বাইরের ঘরে ঢুকল কেউ। হেঁটে গেল শাজিনের অফিসের দিকে। দরজা খুলল। সুইচবোর্ড অন করার শব্দ। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল কেউ।

'কে, দেখে আসি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আপনারা সব এখানেই থাকুন। আমি না ডাকলে নড়বেন না।'

মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে সেক্রেটারির অফিসের দিকে এগোল সে। ডেস্কের ভেতরের দিকটায় এসে বসে পড়ল। দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শাজিনের অফিসে ডেস্কের এককোণে ঝুঁকে রয়েছে কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি। মুখটা উল্টোদিকে ফেরানো।

আস্তে হাত বাড়িয়ে সেক্রেটারির ডেস্কে রাখা ইনটারকমের সুইচটা অন করে দিল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ভারী নিঃশ্বাস আর অস্থির ভঙ্গিতে টেবিলে অধৈর্য আঙুল ঠোকার শব্দ।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরে মগজে। বসে থেকেই টান দিয়ে ড্রয়ারটা

খুলল। ডিকটেশন মেশিনটা পাওয়া গেল। সারিয়ে নিয়ে এসেছে। ভাল। কাজ হবে এখন। ইনটারকমের পাশে সেটা রেখে 'রেকর্ড' লেখা বোতামটা টিপে দিল।

খিলখিল হাসির শব্দ।

–'আরে হ্যাঁ···হ্যাঁ,' কথা শুনতে পাচ্ছে কিশোর, 'আজ সকালেই গিয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের অত সাধের বাগানটার অর্ধেকটাই নেই আর, বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে···কৈফিয়ত? কোন সমস্যা নেই। স্রেফ বলে দেব, ড্রাইভার ভুল করেছে। ক্ষমাটমা চাওয়া যেতে পারে পরে, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না, বাগান আর ফেরত আসবে না···' আবার হাসি। 'এ রকম ভুল হতেই পারে, তাই না?'

মনে মনে রাগে জ্বলে উঠল কিশোর। মহিলাটা মানুষ না, আসলেই ড্রাকুলা!

'ভ্যানটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' শাজিন বলছে। 'পেছনে রাখা জিনিসগুলো জলদি ফেলে দিয়ে আসুন।···হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবেন টাকা, যা বলেছি পাবেন। কাজটা আগে হয়ে যাক···তবে মুখ বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে। খুললে আপনিও বিপদে পড়বেন। আপনি আমাকে সহায়তা করেছেন, অস্বীকার করতে পারবেন না। প্রমাণ করে দিতে পারব আমি। বন্দুকটার লাইসেন্সও আপনার নামে। পুলিশ জানতে পারলে আমাকে যেমন ছাড়বে না, আপনাকেও ছাড়বে না।'

আস্তে মাথা তুলে তাকাল আবার কিশোর। এখনও এদিকে পেছন ফিরে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে শাজিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ইনটারকমে আবার ভেসে এল তার কণ্ঠ। 'হ্যাঁ, মিস্টার সেভারন জায়গাটা বেচতে রাজি হয়ে গেলেই কাজ শুরু করে দিতে পারব আমরা। আবার টাকা আসতে আরম্ভ করবে। এখনকার টানাটানি আর থাকবে না।···কি বললেন?' আবার হাসি। 'ঠিকই আছে, বুড়োটার উপযুক্ত শাস্তি···ভালভাবে বলেছিলাম, কানে তোলেনি···'

পেছনে খুট করে শব্দ হতে ফিরে তাকাল কিশোর। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার সেভারন। ছড়িটা তুলে ধরেছেন। রাগে লাল হয়ে গেছে চোখমুখ।

'আরে করছেন কি!' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন! দেখে ফেলবে তো!'

কিন্তু কানেও তুললেন না মিস্টার সেভারন। চিৎকার করে উঠলেন, 'শয়তান বেটি! আরেকটু হলেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল আমার···শয়তানি করে করে আমার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়েছিস, আমার জায়গা তছনছ করেছিস, তোকে আমি ছাড়ব না!'

গটমট করে গিয়ে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি। এত জোরে ধাক্কা দিলেন, দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। লাগলে যে কেটে যেতে পারে, তোয়াক্কাই করলেন না। লাঠিটা নাড়তে নাড়তে গিয়ে ঢুকলেন শাজিনের অফিসে,

'শয়তান...'

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর, 'মিস্টার সেভারন!'

পেছনের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে জ্যাকি। কিশোরের আগেই গিয়ে বাবার হাত চেপে ধরল। 'বাবা, কি করছ! থামো না!'

ঘুরে দাঁড়িয়েছে অগাস্ট শাজিন। গায়ে কালো জ্যাকেট, পরনে কালো জিনস। লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁত। মনে হচ্ছে, যে কোন সময় বেরিয়ে আসবে জানোয়ারের মত শ্বদন্ত-ড্রাকুলার যে রকম থাকে।

জ্যাকির ওপর চোখ পড়তে সরু হয়ে এল চোখের পাতা। ধমকে উঠল, 'এখানে কি? তোমার তো জেলে থাকার কথা।' পেছনে তিন গোয়েন্দাকে দেখে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, সরু হলো আবার; মোমের মত ফ্যাকাসে চেহারায় কালো ছাপ পড়ল। 'হচ্ছেটা কি?'

'আপনি যে একটা মিথ্যুক, সেই প্রমাণ জোগাড় হয়ে গেছে আমাদের,' রাগত স্বরে বলল জ্যাকি।

কিশোরের বগলে চেপে রাখা ফাইলের দিকে তাকিয়ে কালো চোখের মণি জ্বলে উঠল শাজিনের। 'পুলিশকে যখন বলব, চুরি করে আমার অফিসে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করেছ তোমরা,' শীতল কণ্ঠে বলল সে, 'কে কার কথা বিশ্বাস করে, কে সত্যিকার বিপদে পড়ে, দেখা যাবে তখন।'

'এবার আর আপনাকে বিশ্বাস করছে না ওরা,' কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'আপনার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। সেভারনদের বাগান নষ্ট করতে ডিগার পাঠিয়েছেন, ওঁদের শান্তি নষ্ট করেছেন, নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছেন ওঁদের, ব্ল্যাকমেল করেছেন; অভিযোগের অন্ত নেই, ক'টা অস্বীকার করবেন?' ফাইলটা নাড়ল সে। 'আপনার শয়তানির সমস্ত প্রমাণ রয়েছে এর মধ্যে।'

হঠাৎ ডাইভ দিয়ে পড়ল শাজিন। ড্রয়ার খোলার শব্দ। আবার যখন উঠে দাঁড়াল সে, হাতে উদ্যত ছোট একটা পিস্তল। কিশোরের দিকে হাত বাড়াল। 'ফাইলটা দাও!'

'জ্বী-না!' ফাইল সহ হাতটা পেছনে নিয়ে গেল কিশোর, 'আপনার কথা আর শোনা হচ্ছে না।'

'দেখো, বোকামি কোরো না!' বরফের মত শীতল শাজিনের কণ্ঠ, 'ভাল চাও তো, দাও বলছি!'

'দিয়ে দাও, কিশোর,' মৃদুস্বরে বলল জ্যাকি। 'ওকে বিশ্বাস নেই। সত্যি সত্যি গুলি করে বসবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাইলটা দিয়ে দিল কিশোর।

'ও-কে,' ফাইলটা গোল করে পকেটে ঢুকিয়ে, এগিয়ে এসে মিস্টার সেভারনের হাত চেপে ধরল শাজিন। 'বুড়োটাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। কেউ আমার পিছে পিছে আসার চেষ্টা করলে...'

'নিতে যদি না দিই?' মুসা বলল।

'বাধা দিয়ে দেখো খালি,' ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল শাজিনের। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

মিস্টার সেভারনের হাতটা বাঁকিয়ে পিঠের ওপর নিয়ে এল শাজিন। পিস্তলটা অন্যদের দিকে নিশানা করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাঁকে।

'যেতে দিচ্ছ কেন!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

মাথা নেড়ে জ্যাকি বলল, 'কিছু করার নেই। বাধা দিলে যা বলছে তাই করবে। বরং অপেক্ষা করাই ভাল। বাইরে নিয়ে বাবাকে ছেড়ে দেবে।'

মিস্টার সেভারনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শাজিন।

ডিকটেশন মেশিনটার কাছে এসে টেপের ক্যাসেটটা বের করে নিল কিশোর। পকেটে রেখে দিল।

ওটাতে কি আছে বুঝতে পারল জ্যাকি। নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'কিন্তু বাইরে নিয়ে গিয়ে আপনার বাবাকে যদি কিছু করে!' রবিন বলল।

এই সময় সিঁড়ি থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।

'সর্বনাশ!' বলেই দৌড় দিল জ্যাকি।

তিন গোয়েন্দাও ছুটল পেছনে।

দোতলার ল্যান্ডিং ফ্লোরে বসে আছেন মিস্টার সেভারন। বিমূঢ়ের মত তাকাচ্ছেন। হাতে শাজিনের পিস্তলটা। ছেলেদের দেখে বললেন, 'ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছি। পিস্তলটা মাটিতে পড়ে আপনাআপনি গুলি বেরিয়ে গেল।'

তাঁর ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'ওর গায়ে লেগেছে?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, 'না। নিচে গড়িয়ে পড়েই লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল। তাড়াতাড়ি গেলে এখনও ধরতে পারবে...'

হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। নিচতলায় নামতেই কানে এল পুলিশের সাইরেন। পরক্ষণে ব্রেকের শব্দ।

'পুলিশ!' ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর, 'ওরা জানল কি করে?'

এক মুহূর্ত পরেই সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগল পুলিশের লোক, জোড়ায় জোড়ায়। সিঁড়ির দিকে ছুটল।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল একজন। তিন গোয়েন্দা আর জ্যাকিকে দেখছে। তারপর তাকাল মিস্টার সেভারনের দিকে। তিনিও নেমে আসছেন। 'আপনি কি মিস্টার সেভারন? আপনার পড়শী ফোন করেছে থানায়। বলেছে, আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন...?'

'একজন মহিলাকে যেতে দেখেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

অবাক হয়ে মাথা নাড়ল অফিসার, 'কই, না তো!'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওরাও অবাক।

'আমি জানি কোনখান দিয়ে গেছে!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সাইরেন শুনে আর সামনের দিকে যায়নি, ফায়ার এসকেপ দিয়ে পালিয়েছে!'

'জলদি!' লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। 'ধরতে হবে!'

জ্যাকি আর তার বাবা পুলিশের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে রয়ে গেল, তিন গোয়েন্দা ছুটল শাজিনকে ধরার জন্যে। মুসা যে জানালাটা দিয়ে ঢুকেছিল,

সেটার কাছে এসে দেখল, ফায়ার এসকেপ থেকে নেমে পড়েছে শাজিন। বাঁধানো চত্বর দিয়ে দৌড়ে চলেছে। আঙিনার সীমানায় গিয়ে একটা দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধরার চেষ্টা করতে হবে,' বলেই ছুটল আবার।

ওদেরকে দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল অফিসার, 'অ্যাই, অ্যাই, কোথায় যাচ্ছ?'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। চোখের পলকে আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। কাঠের দরজাটার দিকে ছুটল।

দরজার ওপাশে একটা অন্ধগলি। উঁচু দালানের জন্যে ঠিকমত আলো ঢুকতে পারে না বলে আবছা অন্ধকার। দুদিকের দেয়ালেই আগাছা জন্মেছে। রাতের কুয়াশা পানি হয়ে জমে আছে এখনও। ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। রাস্তায় আবর্জনার ছড়াছড়ি। পানি আর মদের বোতল স্তূপ হয়ে আছে এখানে ওখানে।

'আরি!' আগে আগে ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। নিচু হয়ে তুলে নিল কি যেন। 'ওই কাগজগুলো!...ঘটনাটা কি?'

রবিন আর মুসাও দেখল দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে বাতাসে বাড়ি খেতে খেতে নিচে পড়ছে কয়েকটা কাগজ।

'খাইছে!' কাগজ কুড়াতে শুরু করল মুসাও। 'ফেলে দিল কেন?'

'হয়তো আমাদের ঠেকানোর জন্যে,' রবিন বলল। 'কাগজ দেখলে কুড়ানো শুরু করব আমরা, থামব, এই সুযোগে সে পালাবে।'

'চালাক কত! পালাতে দিচ্ছি না আজ শয়তানটাকে,' বলেই দৌড় দিল মুসা।

গলির শেষ মাথায় বেরিয়ে দেখল একটা ছোট পার্কিং লট। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আবার শাজিনকে চোখে পড়ল তিন গোয়েন্দার। কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরোনো একটা লোককে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলতে ফেলতে তার পাশ কেটে ছুটে চলে গেল। একপাশে জেটি। পার্কিং লটের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে বাঁধা রয়েছে কয়েকটা মোটর ক্রুজার।

হাত তুলল কিশোর, 'ওই যে! জেটির দিকে যাচ্ছে।'

দাঁড়িয়ে গেল সে।

মুসাও দাঁড়াল, 'কি হলো?'

'বুঝেছি! এসো!' আবার ছুটল কিশোর।

জেটির কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল শাজিন। দ্রুতহাতে একটা বোটের দড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলল ডেকে। কিন্তু ডেকে না পড়ে পানিতে পড়ল ওটা।

বোটে ওঠার আগেই পেছন থেকে গিয়ে তার জ্যাকেট খামচে ধরল মুসা। কিন্তু রাখতে পারল না। আশ্চর্য শক্তি শাজিনের শরীরে। ভূতই মনে হলো মুসার। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল। ঝাড়া দিয়ে ওর হাত থেকে জ্যাকেটটা ছাড়িয়ে নিয়েই এক লাফে গিয়ে ছোট মোটর বোটটায় উঠে পড়ল শাজিন।

নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেল মুসা। চিত হয়ে পড়ল শান বাঁধানো ঘাটে। ব্যথা পেল পিঠে। রবিন আর কিশোর পৌঁছতে দেরি করে ফেলল। ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে শাজিন। অসহায় হয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা, ঘাট থেকে সরে যেতে শুরু করেছে বোটটা।

নড়ে উঠল রবিন। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'মরার দরকার নেই।'

'কিন্তু চলে যাচ্ছে তো!' রাগে মাটিতে পা ঠুকল রবিন।

'স্পীড বোটের সঙ্গে সাঁতরে পারবে না।'

'দেখো এটা কি?' হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ব্যালাক্লাভা। শাজিনের পকেট থেকে পড়েছে।'

'আজ আর বাঁচতে পারবে না, সেজন্যেই ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ; প্রমাণের পর প্রমাণ ফেলে যাচ্ছে,' কিশোর বলল। 'এটা মাথায় দিয়ে সে নিজেই যেত সেভারনদের বাড়িতে। নানা রকম পোশাক পরে বিভিন্ন সাজে সমস্ত শয়তানিগুলো সে একাই করেছে, কেউ তার দোসর ছিল না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, সেভারনদের বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ঢোকেনি?' মুসা অবাক।

'না।'

'কিন্তু ধরতে না পারলে কিছুই করা যাবে না,' রবিন বলল। 'দেখো দেখো, লকটার দিকে যাচ্ছে। আগেই গিয়ে গেটটা বন্ধ করে দিতে পারলে…'

বলে আর দাঁড়াল না সে। গেটের দিকে ছুটল প্রাণপণে।

মুসা আর কিশোরও তার পিছু নিতে যাচ্ছিল, এই সময় পাশে এসে থামল একটা পুলিশের গাড়ি। জ্যাকি আর তার বাবা বসে আছেন ওতে। টপাটপ লাফিয়ে নামল একজন পুলিশ অফিসার আর জ্যাকি।

'শাজিন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকি।

হাত তুলে দেখাল কিশোর।

'পালালই শেষ পর্যন্ত?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না। রবিন গেছে গেটটা বন্ধ করতে। শাজিন বেরিয়ে যাবার আগেই যদি বন্ধ করে দিতে পারে…'

কথা শেষ করার আগেই আবার গিয়ে গাড়িতে বসল অফিসার। জ্যাকিও উঠল। সরে জায়গা করে দিল মুসা আর কিশোরকে। কিশোর দরজা লাগানোর আগেই চলতে শুরু করল গাড়িটা।

গেটের কাছে পৌঁছে দেখা গেল পাগলের মত হাতলটা ঘোরাচ্ছে রবিন, বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল জ্যাকি। গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে আবার বোটের নাক ঘুরিয়ে দিতে গেল শাজিন। কোন কারণে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনটা। মরিয়া হয়ে বার বার দড়ি টেনে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে।

এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা। কোনদিকে না তাকিয়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তীব্র স্রোতকে অগ্রাহ্য করে সাঁতরে এগোল বোটের

দিকে। ধরে ফেলল পানিতে পড়ে থাকা বোট বাঁধার দড়িটা। ঘুরে গিয়ে টেনে নিয়ে সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

দড়িটা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল শাজিন। কিন্তু ছাড়বে না আর, পণ করে ফেলেছে মুসা। একবার হাত থেকে জ্যাকেট ছুটিয়েছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর দড়ি ছুটাতে দেবে না।

পানিতে ঝাঁপ দিতে গিয়েও থেমে গেল শাজিন। তীরে দাঁড়ানো পুলিশের দলকে নজরে পড়েছে। বুঝতে পারল, পানিতে পড়েও বাঁচতে পারবে না আজ। খুব শীঘ্রি তাকে টেনে তুলবে পুলিশ। অহেতুক পানিতে পড়ে ভেজার কষ্ট করার চেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বোটের সীটে বসে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তীরে পৌঁছতে অনেকগুলো আগ্রহী হাত এগিয়ে এল মুসার দিকে। কেউ দড়িটা নিয়ে নিল তার কাছ থেকে, কেউ চেপে ধরল দুই হাত। তুলে আনল তাকে পানি থেকে।

'বাপরে বাপ!' ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ফেলতে ফেলতে বলল মুসা, 'যা ঠাণ্ডা! বরফও এরচেয়ে ভাল!'

বোট থেকে নামানো হলো শাজিনকে। গাড়িতে তুলল তাকে পুলিশ।

*

'কখন সন্দেহ করলে এ সব শাজিনের শয়তানি?' ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে ম্যানিলা রোডে যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করল জ্যাকি।

'লোগোটা দেখে।'

'তারপর?'

'তদন্ত চালিয়ে গেলাম। কেন সে এসব করছে, বুঝতে সময় লাগল না।'

'কি যে উপকার করলে তোমরা,' কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন মিস্টার সেভারন। 'বলে বোঝাতে পারব না!'

প্রশংসা-পর্বটা এড়ানোর জন্যে আগের কথার খেই ধরে কিশোর বলল, 'তবে আজকের আগে বুঝতে পারিনি, সব কাজ সে একাই করেছে। আমরা ভেবেছিলাম, তার একজন পুরুষ সহকারীও আছে। সেদিন বনের মধ্যে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মুসাদের ভয়ও দেখিয়েছিল সে নিজেই। কাঁটাঝোপের ওপর পড়ে গিয়ে হাত ছিলে ফেলেছিল, হাতের প্লাস্টার সেটাই প্রমাণ করে...'

বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখা গেল, সামনের রাস্তায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ডিগারটা। গেটের কাছে একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছেন মিসেস সেভারন।

'অফিসার আমাকে বলেছে, রেডিওতে থানায় জানিয়ে দিয়েছে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'এত তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দেবে থানা থেকে, ভাবিনি। ভালই হলো। ড্রাইভারের সঙ্গে আর ঝগড়া করা লাগল না।'

- আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মিসেস সেভারনের পাশে। চিনতে পারল মুসা। এই লোকটাকেই দূরবীন নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে বনের ভেতর।

গাড়ি থামাল জ্যাকি। তিন গোয়েন্দাকে বলল, 'নামো তোমরা। মা তোমাদের চা না খাইয়ে ছাড়বে না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসা বলল, 'তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। দূরবীনওয়ালা লোকটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে, শাজিনের সঙ্গে কিভাবে জড়িত ছিল।'

ভুরু কোঁচকাল জ্যাকি, 'জড়িত ছিল মানে?'

লোকটাকে কোথায়, কিভাবে দেখেছে জানাল মুসা।

হেসে উঠল জ্যাকি। 'আরে ও তো আমাদের রবার্ট লিওনেল। শখের পক্ষী-বিজ্ঞানী। সারাক্ষণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর পাখি দেখে।'

'ও, তাই!' দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মুসা।

গাড়ি থেকে নামল ওরা।

জ্যাকির কাছে সব শুনে এগিয়ে এলেন লিওনেল। মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেদিন বনের মধ্যে তোমার ঘোড়াটাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

'না না, ঠিক আছে,' বলতে যাচ্ছিল মুসা, বলা হলো না, টেলিফোন কোম্পানির একটা গাড়ি এসে থামল।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল একজন লোক। 'আপনাদের তারে কোনখানে গণ্ডগোল হয়েছে, সেজন্যেই লাইন পাচ্ছেন না। খুঁজে বের করে এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি...'

কিশোর অনুমান করল, শাজিনই তারটা ছিঁড়েটিড়ে দিয়ে থাকবে কোন জায়গায়, সেভারনদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে, যাতে ডিগার নিয়ে বাগান ভাঙতে এলে তাঁরা থানায় যোগাযোগ করতে না পারেন।

*

'আমাকে নিয়ে তো খুব হাসাহাসি করা হয়েছে,' রান্নাঘরের টেবিলে কাপে চা ঢালতে ঢালতে হেসে বললেন মিসেস সেভারন, আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে, 'ভূতের কথাটা কি ভুল বলেছি?'

'ভূত নয়, মানুষ। ফিনফিনে পোশাক পরে শাজিনই ভূত সেজেছিল।'

'সে যা-ই হোক, দেখেছি তো ঠিকই, চোখের ভুল ছিল না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। ওর পোশাকের কাপড়ই ছিঁড়ে আটকে গিয়েছিল সেলারে নামার ট্র্যাপ-ডোরে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'আসল ভূত হলে সত্যি খুব মজা হত।' শাজিন আসল ড্রাকুলা না হওয়ায় নিরাশই মনে হচ্ছে ওকে।

'সেলারে আরেকবার চোখ বোলাতে চাই আমি,' কিশোর বলল। 'কে জানে, নতুন আর কোন রহস্য পেয়ে যাই কিনা?'

হেসে উঠল জ্যাকি, 'তোমরা মনেপ্রাণে গোয়েন্দা। রহস্যের খোঁজে থাকো সব সময়, রহস্য না হলে বাঁচো না। যোগ্য লোক পাওয়া গেছে এতদিনে। চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। জোয়ালিনের ভূতের রহস্য সমাধানের ইচ্ছে আমারও অনেক দিনের।'

'তাই নাকি? চলুন!' সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠল কিশোর। 'দারুণ হবে! বলা যায় না, ভূত খুঁজতে গিয়ে ওয়ারনার পরিবারের গুপ্তধনের নকশাও পেয়ে যেতে পারি।'

'ও, তাই বলো, গুপ্তধন,' হাসল রবিন। 'আমি ভাবছিলাম ভূত খুঁজতে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন তোমার?'

'গুপ্তধনের কথা আবার কার কাছে শুনলে?' চোখ বড় বড় করে তাকাল মুসা। তার ওঠার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। আয়েশ করে ফ্রুটকেক চিবুচ্ছে।

'শুনিনি, অনুমান। এত বড়লোক ছিল যখন, গুপ্তধন তো থাকতেই পারে, তাই না?'

'তা পারে!' রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মুসার মধ্যে তেমন উত্তেজনা নেই। হাত নেড়ে বলল, 'গুপ্তধন উদ্ধারে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেড়শো বছরের পুরানো সেলারে জোয়ালিনের ভূতও থাকতে পারে। ওর বাবার ধনরত্ন লুট করতে যাচ্ছি দেখলে ঘাড়টা ধরে মটকে দিতে পারে। মিসেস সেভারন, আপনার কোন আপত্তি না থাকলে এই ফ্রুটকেকটা আমি পুরোটাই খাব। বলা যায় না, জীবনের শেষ খাওয়াও হতে পারে এটা।'

শেষ